ট্রেজার আইল্যান্ড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

ট্রেজার আইল্যাণ্ড

রূপান্তর

ডঃ মিলন দত্ত

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭সি কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

ট্রেজার আইল্যাণ্ড

॥ আমাদের অন্যান্য অনুবাদ ও কমিকস গ্রন্থ ॥

অনুবাদ সিরিজ

ক্যুয়ো ভাদিস	ডঃ মিলন দত্ত
মবি ডিক	”
অ্যাডভেঞ্চার অব টম সইয়ার	”
ফ্রাঙ্কেন্টাইন	”
ডাঃ জেকিল এ্যান্ড মিঃ হাইড	”
অলিভার টুইস্ট	”
দি লাস্ট ডেজ অব পম্পেই	শ্যামলী বসু

কমিকস

ডন কুইক্সোট
থ্রী মাস্কেটিয়ারস
মহাভারত / রামায়ণ

॥ লেখক পরিচিতি ॥

রবার্ট লুই স্টিভেনসন ইংরেজি সাহিত্যের স্মরণীয় লেখক। ১৮৫০ সালের ১২ই নভেম্বর স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরায় তাঁর জন্ম হয়।

ছেলেবেলা থেকে স্টিভেনসন অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকার ওয়াল্টার স্কটের দুঃসাহসিক উপন্যাসগুলো পড়তে তিনি খুব ভালোবাসতেন। এর ফলে স্কটের মতো উপন্যাস রচনার প্রবল ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে।

তেরো বছর বয়সে তিনি বাবা মার সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

সতেরো বছর বয়সে দেশে ফিরে স্টিভেনসন পড়াশুনা শুরু করলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি ভালো ভাবে পড়াশুনা করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন চিররুগ্ন। বাইশ বছর বয়সে তাঁর পরিচয় হল কেম্ব্রিজের এক মহিলা অধ্যাপিকার সঙ্গে। তাঁর প্রেরণায় তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করলেন। একত্রিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হল তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'। এই বই লিখে তিনি খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন।

এরপর একে একে প্রকাশিত হল—প্রিন্স অটো, ডাঃ জেকিল এ্যাণ্ড মিঃ হাইড, কিডন্যাপড, দি ব্ল্যাক অ্যারো, দি বটল ইমপ প্রভৃতি বই। সারা বিশ্বে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

অধিকাংশ বইই তিনি লিখেছেন রোগশয্যায় শুয়ে।

শেষের দিকে আর লেখার ক্ষমতা ছিল না। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এই প্রতিভাবান লেখকের মৃত্যু হয়।

॥ কে এই অদ্ভুত আগন্তুক ? ॥

সমুদ্রের ধারেই আমাদের হোটেল। নাম 'রেনবো হোটেল।'

হোটেল চালান আমার বাবা। আমি বাবাকে নানা কাজে সাহায্য করি।

যেখানে লোকজন বেশী, সেখানে হোটেল ভাল চলে। আমরা যে জায়গাটায় থাকি, সেখানটা খুব নির্জন। লোকজনের আনাগোনা কম। তাই হোটেল ভাল চলে না।

জাহাজের দু'চারজন নাবিক-টাবিক আমাদের খদ্দের।

একদিন সকালবেলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি।

হঠাৎ কানে এল বেসুরো গলার গান—

মরা মানুষের বাক্সে
পনেরোটা নাবিক ভাসে

এই অদ্ভুত বেসুরো গান শুনে আমি সামনের দিকে তাকালাম। লম্বা একটা লোক কি যেন ঠেলতে ঠেলতে এদিক পানে আসছে।

আরো কাছে এলে তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

লোকটা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। গায়ে নাবিকদের নীল পোশাক! গালের উপর লম্বা কাটা দাগ। কোমরে লম্বা একটি তরবারি। একটা ছোট ঠেলাগাড়ির উপর সিন্দুক। ঠেলা গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে আমাদের হোটেলের দিকে এগিয়ে আসছে। মুখে সেই অদ্ভুত গান।

লোকটা ঠেলাগাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে হোটেলের ভেতরে নিয়ে এল। দোরগোড়ায় আমাকে দাঁড়ানো দেখে রাজার মতো হুকুম করল—

—এ্যাই, এক বোতল মদ নিয়ে আয় তো।

ইতিমধ্যে বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন।

চোখের ইঙ্গিতে আমাকে মদ আনতে বললে আমি এক বোতল মদ এনে দিলাম।

লোকটা বোতলের ছিপি খুলে মুখের মধ্যে সবটুকু মদ ঢেলে দিয়ে বলল, আঃ! বেশ, বেশ! ভারী চমৎকার!

বাবা জানতে চাইলেন, আপনি কি এখানে থাকবেন স্যার?

—থাকতেই তো এসেছি। বেশ নির্জন জায়গা।

—হ্যাঁ। জায়গাটা খুব নির্জন। এদিকটায় বিশেষ কেউ আসে না।

—ভারী চমৎকার। এই তো চাই। নির্জন জায়গাই আমার পছন্দ।

ডোভার বন্দরের এক হোটেল মালিক তোমার হোটেলের কথাই বলেছিল বোধ হয়।

লোকটার ভাবভঙ্গী বাবার পছন্দ হচ্ছিল না। এ ধরনের লোকের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করা মুস্কিল।

লোকটা সম্ভবত বাবার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল। বাবাকে চুপ করে থাকতে দেখে খেঁকিয়ে উঠল, কি! চুপ করে আছো কেন? আমাকে থাকবার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছ না কেন? বলি ঘর আছে তো?

—ঘর তো আছে। কিন্তু···

—ও, ভাবছো, আমি টাকা পয়সা কিছু দিতে পারবো না। ফুঃ! কত টাকা তুমি চাও?

এই বলে কোটের পকেট হাতড়ে চারটে গিনি বের করে ঘরের মেঝেতে ছুড়ে দিয়ে বলল, এই আপাতত রাখ। ফুরিয়ে গেলে আরো চেয়ে নিও। এখন দয়া করে ঘরটা দেখিয়ে দাও।

বাবা গিনিগুলো মেঝে থেকে তুলে নিয়ে আমাকে উপরের কোণের ঘরটা খুলে দিতে বললেন।

আমি চাবি নিয়ে ঘর খুলতে চললাম।

লোকটি ঠেলাগাড়ির হাতল ধরে আমার পিছন পিছন আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল।

বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ শোন, কয়েকটা কথা তোমায় আগে ভাগে বলে দি। খাবার-টাবার যা দেবে তাই খাবো। তবে মদটা কিন্তু বেশী দিতে হবে। আর হ্যাঁ, তোমার হোটেলের কোন লোক যেন আমায় বিরক্ত না করে। বিরক্ত করলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি। রাগের মাথায় আমি খুনটুনও করে ফেলতে পারি। আমি নিরিবিলি থাকতে চাই। বুঝেছ?

বাবা মাথা নাড়লেন। বুঝেছেন।

—ভারী চমৎকার! ঠিক আছে। চলো।

লোকটি ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। আমি ঘরের জানলা খুলে দিলাম।

সামনেই নীল সমুদ্র গর্জন করে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে।

প্রচণ্ড হাওয়ায় জানলার পাল্লা কাঁপছে ঠক ঠক করে।

ঘরের মধ্যে এই লম্বা-চওড়া লোকটি। সব মিলিয়ে আমার মনের মধ্যে কেমন ভয় ভয় করতে লাগল।

কে এই লোকটি? সমুদ্রের ঝড়ো বাতাসের মতো আমাদের হোটেলে ঢুকে পড়ল?

আমাদের কি বিপদের বার্তা নিয়ে এসেছে এ? এর নাম কি? এর পরিচয় কি? কে এই অদ্ভুত আগন্তুক?

খাটের উপর বিছানা পেতে দিয়ে আমি ওর খাবারের ব্যবস্থা করতে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

॥ সেই এক-ঠ্যাঙওয়ালা লোকটি কোথায়? ॥

সেই লম্বা-চওড়া দৈত্যের মতো লোকটাকে প্রথমে যতটা খারাপ মনে হয়েছিল, দু-চার দিন মেলামেশায় বোঝা গেল, লোকটা ততটা খারাপ না।

মুখে সব সময় তর্জন গর্জন। কিন্তু মনটা ভালো।

নাম বলেছিল ক্যাপ্টেন।

আমরা ওকে ক্যাপ্টেন নামেই ডাকতাম।

ক্যাপ্টেন খুব সকালে উঠে বেরিয়ে যায়। আমাদের হোটেলের কাছে আছে একটা উঁচু টিলা। টিলায় উঠলে চারধারের সব কিছু বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

ক্যাপ্টেন ওই টিলার উপর উঠে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকে। কি দ্যাখে কে জানে।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে আবার ঘরে বসে মদ নিয়ে। ওই সময়টা তার মেজাজ বেশ ভালো থাকে।

আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, টিলার উপর উঠে আপনি কি দ্যাখেন ক্যাপ্টেন? সমুদ্র?

—সমুদ্র? ফুঃ! সমুদ্রের আবার দেখার কি আছে?

—তবে?

—তোমাকে বলতে পারি যদি তুমি কাউকে না বলো।

—আমি কাউকে বলবো না।

—শোন, আমি টিলার উপর উঠে দেখি কোন এক-ঠ্যাঙওয়ালা লোক এ অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছে কি না।

—এক-ঠ্যাঙওয়ালা লোক?

—হ্যাঁ, এক-ঠ্যাঙওয়ালা লোক। আসার পরদিন থেকে তো লক্ষ্য রাখছি। টিলার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমারই তো ঠ্যাঙ ভেঙে যেতে বসেছে। তুমি একটা কাজ করবে খোকা?

—কি?

—তুমি তো বাইরে বাইরে সব সময় ঘোরো। এক-ঠ্যাঙওয়ালা কোন লোককে দেখতে পেলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে। অবশ্য তোমাকে এমনি এমনি খাটাবো না। এর জন্যে তোমাকে মাসে চার পেনী মজুরি দেব।

আমি সোৎসাহে রাজী হয়ে গেলাম। এ আর এমন বেশী কঠিন কাজ কি! পথে ঘাটে শুধু সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এক-ঠ্যাঙওয়ালা লোক দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ক্যাপ্টেনকে খবর দেওয়া।

এর পর আমার কাজ হল সেই এক-ঠ্যাঙওয়ালা লোকটাকে খুঁজে বেড়ানো!

কিন্তু কোথায় সেই এক-ঠ্যাঙওয়ালা লোক?

আমাদের অঞ্চলে কোথাও এমন লোককে দেখতে পাই না।

আর এদিকে মহা মুস্কিল।

দেখা হলেই ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করে, দেখতে পেলে?

আজ্ঞে না।

খোঁজ খোঁজ—ভালো করে খোঁজ। ঠিক দেখতে পাবে।

কিন্তু দেখতে আমি পাই না। এদিকে দেখতে দেখতে মাস কেটে গেল। আমি ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে বললাম, এবার আমার মজুরি চার পেনী দিন।

ক্যাপ্টেন খেঁকিয়ে উঠল, পেনী দেব না টেনী দেব। যা ভাগ। এক-ঠ্যাঙওয়ালা লোকের খোঁজ নেই আবার পেনী চাইতে এসেছে।

আমি ভয়ে এক ছুটে পালিয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন এসে আমার হাতে চার পেনী গুঁজে দিল, যা এবার ভালো করে লক্ষ্য রাখিস।

লক্ষ্য তো ভালো করেই রাখি। কিন্তু কোথায় সেই এক-ঠ্যাঙওয়ালা লোকটি?

॥ ডাক্তারের কাছে ক্যাপ্টেন জব্দ ॥

এদিকে আমাদের হোটেলের অবস্থা তো খুব খারাপ।

খদ্দের-টদ্দের নেই বললেই চলে। টাকার আমদানি বন্ধ। বাবার মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া।

এর পর আবার ক্যাপ্টেন। গোদের উপর বিষফোঁড়া। টাকা

পয়সা দেবার নাম নেই। সেই যে এসে চারটে গিনি ঠেকিয়েছিল, তা কবে শেষ হয়ে গেছে।

বাবা দু চারবার টাকা চেয়েছিলেন।

লোকটা বিকট চেঁচিয়ে বলেছিল, টাকা? কিসের টাকা?

—আজ্ঞে আপনার খাই খরচ?

—কেন, সেই যে তোমাকে গিনি দিয়েছিলাম।

—আজ্ঞে তা তো খরচ হয়ে গেছে।

—এর মধ্যে খরচ হয়ে গেল! খরচ হতেই পারে না।

—আজ্ঞে—

—দ্যাখ আমাকে বিরক্ত করো না বলছি।

ক্যাপ্টেন এক লাফে উঠে দাঁড়াতো। কোমরের তরবারি ঝনঝন শব্দে বেজে উঠতো। গালের কাটা দাগটা আরো বীভৎস দেখাতো।

আমার ভালোমানুষ বাবা ওই রুদ্রমূর্তি দেখে পালিয়ে আসতে বাধ্য হতেন।

দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় বাবা অস্থির। এতগুলো মানুষের খাওয়া-পরার দায়িত্ব। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখ ক্রমশ বেড়েই চলল।

শেষে উপায় না দেখে ডাক্তার লিভোসীকে ডেকে আনলাম। ডাক্তার লিভোসী আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। অসুখ-বিসুখে তিনিই আমাদের চিকিৎসা করেন। মানুষটা ভালো। তবে একটু রগচটা।

ডাক্তারবাবু বাবাকে দেখে নীচে নেমে এলেন।

ক্যাপ্টেন তখন আসর জাঁকিয়ে গল্প ফেঁদে বসেছিল।

গাঁয়ের মজুর আর চাষীরা হাঁ করে গল্প শুনছে। ক্যাপ্টেন মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে তাদের শোনাচ্ছিল সমুদ্রের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সমুদ্রে জলদস্যুরা কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে সবকিছু লুটপাট করে মানুষ মেরে ফ্যালে, জাহাজ ডুবি হলে নাবিকরা নির্জন দ্বীপে কিরূপ অবর্ণনীয় দুঃখে দিন কাটায় তা ক্যাপ্টেন রসিয়ে রসিয়ে বলছিল।

ডাক্তার নীচে এসে দাঁড়াতে গল্প শ্রোতার দল তাঁকে সেলাম করল।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছো তোমরা?

উত্তরে মজুর আর শ্রমিকের দল যার যার অসুখের ফিরিস্তি বলতে লাগল।

ডাক্তারবাবু তাদের ওষুধ বলে দিতে লাগলেন।

আসর ভেঙে যাওয়াতে ক্যাপ্টেন গেল চটে। গেলাসের সবটুকু মদ গলায় ঢেলে খেঁকিয়ে উঠে বলল, তুমি কে হে? অত কথা বলছো কেন? চুপ করো এখন।

ডাক্তার ঘাড় বাঁকা করে ক্যাপ্টেনকে এক নজর দেখে বললেন, আপনি কি আমাকে চুপ করতে বলছেন?

ক্যাপ্টেন বলল, তুমি যে রকম বক্তিয়ার এছাড়া আর কি বলবার আছে।

ডাক্তারবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আমারও আপনাকে শুধু একটি কথাই বলবার আছে। আপনি যেভাবে সমানে মদ খেয়ে যাচ্ছেন, তাতে পৃথিবীর মাতাল পাজী বদমাসের সংখ্যা শীগগীরই একটি কমে যাবে।

ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠে বলল, কি বললে?

—যা বলেছি আপনি ভালোই বুঝতে পেরেছেন।

—তবে রে। দেখাচ্ছি মজা।

ক্যাপ্টেন এক লাফে উঠে কোমরের তরবারি নিয়ে ছুটে গেল ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তারবাবু বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না।

ধমকে বললেন, তরবারি নামাও বলছি।

ক্যাপ্টেন তরবারি নামায় না দেখে ডাক্তারবাবু কঠিন স্বরে বললেন, তুমি বোধ হয় জানো না যে আমি এ অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট। আমার লোকজনদের দিয়ে তোমায় গ্রেপ্তার করে ফাঁসির দড়িতে লটকাবার ক্ষমতা আমার আছে।

ক্যাপ্টেন যেন অনেকটা চুপসে গেল। ডাক্তারবাবুর দিকে কটমট করে তাকাতে তাকাতে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবুর ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছিল।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে ডাক্তারবাবু ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা বদমাস মাতাল এই হোটেলে এসে উঠেছে, এটা জেনে আমার ভালোই হল। তোমাকে চোখে চোখে রাখতে হবে দেখছি। কোন গোলমালের খবর শুনলেই কিন্তু ঘাড় ধরে এই এলাকা থেকে তোমায় তাড়িয়ে দেব।

ডাক্তারবাবু ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন।

ক্যাপ্টেন মাটিতে থুথু ফেলে বলল, হুঃ। তাড়িয়ে দেবে। অত সোজা। মগের মুল্লুক নাকি।

সেদিনকার মতো আসর ভেঙে গেল।

আমি মনে মনে বললাম, সাবাস ডাক্তারবাবু। ক্যাপ্টেনকে আচ্ছা জব্দ করেছো যা হোক।

॥ এবার এল ব্ল্যাক ডগ ॥

ভোর বেলা হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি।

ক্যাপ্টেন যথারীতি সেই টিলার উপর দাঁড়িয়ে। বাবা অসুস্থ। কাজেই আমাকেই সব দেখাশুনা করতে হয়। হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি, কোন খদ্দের আসে কিনা।

দূর থেকে একটি লোককে আসতে দেখে উৎসাহিত হলাম। কাছে আসতে দেখলাম শুকনো রোগা আধবুড়ো একটি লোক। নিজেই ভালো করে হাঁটতে পারে না, কোমরে আবার ঢাউস এক তরবারি।

লোকটা একবার হাত তুলতেই দেখতে পেলাম, তার ডান হাতের দুটো আঙুল নেই।

লোকটি আমার কাছে এসে বলল, তোমাদের হোটেলে বিল এসেছে?

—বিল কে মশাই?

—বিল যেই হোক না কেন আমার কথার জবাব দাও।

—বিল টিল কেউ এখানে থাকে না।

—তুমি মিথ্যা কথা বলছো। খবর পেয়েছি বিল এখানে এসে উঠেছে।

—বিল নামে তো কাউকে চিনি না। তবে একজন ক্যাপ্টেন এখানে থাকেন।

—ক্যাপ্টেন? কেমন চেহারা বলতো।

—খুব লম্বা চওড়া। গালে কাটা দাগ।

—ওঃ! ওই হচ্ছে বিল। ডান গালে কাটা দাগ—ও সে এক কাণ্ড। ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। তা বিল কোথায়?

—সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছে। আপনি কি ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করতে চান?

—দেখা? হ্যাঁ না—মানে আমি একটু ওকে চমকে দিতে চাই। অনেক দিন পর দেখা তো।

—তাহলে ভিতরে বসুন।

এমন সময় দূরে হেঁড়ে গলায় গান শোনা গেল—

মরা মানুষের বাক্সে
পনেরোটা নাবিক ভাসে

আমি বললাম, ওই তো ক্যাপ্টেন আসছে—

লোকটা চাপা স্বরে বলে উঠল, চুপ। আমার সম্বন্ধে একটি কথাও বলবে না।

এই বলে একটা দরজার আড়ালে লুকিয়ে রইল।

ক্যাপ্টেন গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে লোকটিও দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে উপরে উঠে গেল।

আমিও চুপি চুপি উঠে আড়াল থেকে দেখতে লাগলাম।

ক্যাপ্টেন ঘরের মধ্যে ঢুকে সবে মাত্র মদের গ্লাস নিয়ে বসেছে, এমন সময় লোকটা দরজার সামনে থেকে ডাকল, বিল। ক্যাপ্টেন হাঁ করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন ভূত দেখছে। চোখ-মুখ ফ্যাকাশে। মুখে ভয়ের চিহ্ন। হাতের গ্লাস হাতেই ধরা রইল। রুক্ষ বদমেজাজী ক্যাপ্টেনের এত ভয় পাওয়া দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

এই রোগা আঙ্গুলকাটা লোকটা কে? ওকে দেখে ক্যাপ্টেনের এত ভয় কেন?

—আমাকে চিনতে পারছো না বিল?

—ব্ল্যাক ডগ। তুমি! এতক্ষণে ক্যাপ্টেনের মুখে কথা ফুটল।

—হ্যাঁ। আমি। তোমার সাথে কথা আছে।

—ভিতরে এসে বসো। ক্যাপ্টেন মিন মিন করে বলল।

ব্ল্যাক ডগ বসতে বসতে বলল, অনেক খোঁজ করে তোমার দেখা পেয়েছি। অনেক কথা আছে। খাবার আনাও। খেতে খেতে কথা হবে।

ক্যাপ্টেন আমার নাম ধরে হাঁক দিল। আমি একটু দেরী করেই ঘরে ঢুকলাম।

ক্যাপ্টেন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, যা—আমাদের জন্য খাবার আর মদ নিয়ে আয়।

আমি খাবার আর মদ নিয়ে দিয়ে এলাম।

ওরা খেতে খেতে কথা বলতে লাগল।

আমি আশে-পাশে ঘুর ঘুর করতে লাগলাম।

ওরা প্রথমে নীচু গলায় কথা বলছিল। ক্রমশ গলা খুব চড়তে

INN

লাগল। আর সেই সময় ওদের কথা শুনে বুঝতে পারলাম, ওরা টাকা পয়সার কোন ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করছে। ক্যাপ্টেন কোন কিছু লুকোতে চাইছে। ব্ল্যাক ডগ ওকে ভয় দেখাচ্ছে। হঠাৎ ওদের গলা খুব চড়ে উঠল। দুজনেই চরম ফয়সালা করবার জন্যে প্রস্তুত। উঁকি মেরে দেখি দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে তরবারি হাতে রাগে ফুঁসছে।

—খুন করে ফেলবো।

—তার আগে তোকে খুন করবো।

ওরা দুজনেই তরবারি তুলল মাথার উপর।

আর তাই দেখে আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম।

একটা আর্ত চীৎকার। চোখ মেলে দেখি ব্ল্যাক ডগ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। তার কাঁধের উপর তরবারির আঘাত। গল গল করে রক্ত ঝরছে সেখান থেকে।

ব্ল্যাক ডগ ছুটতে ছুটতে টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভিতরে উঁকি মেরে দেখি, ক্যাপ্টেন দেয়াল ধরে টলছে।

আমাকে দেখে বলল, এ্যাই মদ নিয়ে আয়, মদ।

আমাকে এক্ষুণি এখান থেকে চলে যেতে হবে।

আমি তাড়াতাড়ি এক বোতল মদ আনবার জন্যে নীচে গেলাম। হুড়মুড় করে কি একটা পড়ে যাবার শব্দ হল। ছুটে গিয়ে দেখি, ক্যাপ্টেন চিৎপাত হয়ে মেঝের উপর পড়ে আছে। চোখ বোঁজা। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। মুখ চোখ অসম্ভব লাল। অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মা-ও আমার সঙ্গে উপরে এসেছিলো।

ক্যাপ্টেনকে মেঝের উপর পড়ে থাকতে দেখে মা বললেন, কি বিপদ। ওদিকে তোর বাবার ওই রকম অবস্থা, এদিকে ক্যাপ্টেনের তো মর মর অবস্থা। কি করা যায় বল তো।

—ডাক্তার লিভোসীকে ডাকবো?

—সেই ভাল। তুই তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়।

আমি এক ছুটে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম। ডাক্তার এসে ক্যাপ্টেনকে দেখেই গজগজ করতে লাগলেন, এ আর কি দেখবো। মদই ওকে শেষ করেছে।

মা বললেন, ক্যাপ্টেনের আঘাত লেগেছে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু বললেন, আঘাত না ঘোড়ার ডিম। বেশী মাত্রায় মদ খেয়েই এর এই দশা হয়েছে। দেখি কি করা যায়।

ডাক্তারবাবু নীচু হয়ে বসে ক্যাপ্টেনকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর একটা ছুরি বের করে ওর হাতের শিরা কেটে দিলেন।

প্রচুর রক্ত পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন চোখের পাতা মেলল। ডাক্তারের দিকে চোখ পড়তেই তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ব্ল্যাক ডগ কোথায়?

ডাক্তারবাবু বললেন, ব্ল্যাক ডগ গোল্লায় গেছে। কিন্তু তুমি যদি মদ ছেড়ে না দাও, তুমি সোজা নরকে পৌঁছে যাবে।

হুঃ। মদ ছাড়বে। ক্যাপ্টেন মুখ বিকৃত করল।

—মদ না ছাড়লে মরো। ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

॥ ওই অন্ধ লোকটি কে? ॥

এদিকে বাবার অবস্থা দিনকে দিন খুব খারাপ হতে লাগল। ডাক্তার লিভোসী আশা ছেড়ে দিলেন।

একদিন রাতে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এখন আমরা কি করব? কি ভাবে চলবে আমাদের? এই হোটেলেরই বা কি হবে?

বাবার মৃত্যুর দু দিন পর।

বিকেলের দিকে হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মনটা খুব বিষণ্ণ। দেখি, একটা অন্ধ মানুষ লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে

আসছে। গানের মতো করে বলছে, কাছে পিঠে কেউ থাকলে বলে দাও এটা কোন জায়গা ?

আমি তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললাম, এটা রেনবো হোটেল। আমার গলা শুনেই অন্ধ লোকটা খপ করে আমার হাত ধরে ফেলল। বাপরে বাপ। কি বজ্রমুষ্টি। যেন লোহার হাত। আমার হাত যেন ছিঁড়ে গেল।

আমি কাতর স্বরে বললাম, আমার হাত ছেড়ে দাও।

অন্ধ বলল, হাত তোমার ভেঙে ফেলবো যদি তুমি আমাকে হোটেল রেনবোতে পৌঁছে না দাও।

—সেখানে কি দরকার তোমার ?

—বিলের সঙ্গে দেখা করার দরকার। আর কথা না বাড়িয়ে এবার চলো। অন্ধ লোকটি আমার হাত ধরে এমন হ্যাঁচকা টান দিল যে আমি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটি চাপাস্বরে বলল, চেঁচাবে না। খুন করে ফেলবো।

কি আর করি। আমি অন্ধ লোকটিকে ক্যাপ্টেনের ঘরের সামনে এনে বললাম, ক্যাপ্টেন তোমার সঙ্গে এর কি দরকার আছে।

ক্যাপ্টেন অন্ধ লোকটির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ওর চোখে রাজ্যের ভয়।

অন্ধ লোকটি বলল, বিল নড়াচড়া করবার চেষ্টা করো না। অন্ধ হলেও আমি সব টের পাই। দাও হাত দাও।

ক্যাপ্টেন যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে দিল।

আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ লোকটি তার হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিল। আর তার পরেই অবাক কাণ্ড। তীরবেগে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন ভাঁজ করা কাগজটি খুলে পড়েই খুব অস্থির হয়ে উঠল।

তার মুখ থেকে যেন সব রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে।

বিড়বিড় করে বলল, রাত দশটা—রাত দশটা।

এখন ছয় ঘণ্টা বাকী। আমাকে এখুনি পালাতে হবে। এক্ষুণি। ক্যাপ্টেন যেন তক্ষুণি পালাতে চায়।

হঠাৎ সে মাতালের মতো টলতে লাগল। দুহাতে মাথা চেপে ধরল।

পাগলের মতো চেঁচিয়ে বলল, মদ মদ নিয়ে আয়।

রাত দশটা—এখনো ছয় ঘণ্টা—পালাতে হবে—পালাতে হবে—বলতে বলতে ক্যাপ্টেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ উঠছিল। চোখের তারা স্থির। মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসছিল।

আমি ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলাম।

ডাক্তার এসে দেখে বললেন, সব শেষ।

ক্যাপ্টেন পালিয়ে গেল চিরতরে।

আমার মনে তখন অন্য চিন্তা—অন্ধ লোকটি কে? রাত দশটার সময় কি হতো?

॥ মরা মানুষের সিন্দুক খোলা হল ॥

ডাক্তারবাবু চলে গেলে আমি মাকে সেই অন্ধ লোকটির কথা খুলে বললাম। আমার মনে হল, রাত দশটায় এখানে ভয়ানক কোন ঘটনা ঘটতে পারে। সেই এক-ঠ্যাঙওয়ালা লোক, ব্ল্যাক ডগ, অন্ধ লোক—এরা সব ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষ। ক্যাপ্টেন হয়তো ওদের ফাঁকি দিয়ে কোন মূল্যবান জিনিস নিয়ে এসেছিল, ওরা সেইটে ছিনিয়ে নিতে আসবে।

তবে কি ক্যাপ্টেনের ওই সিন্দুকটার মধ্যে মূল্যবান জিনিস আছে? কি সেই মূল্যবান জিনিস?

আমি মাকে বললাম, মা, ক্যাপ্টেনের কাছে তো আমাদের বহু টাকা পাওনা। আমরা সিন্দুকটা খুলে আমাদের পাওনা টাকা নিয়ে নি না কেন?

মা প্রথমে রাজী হলেন না। অন্যের সিন্দুকে হাত দেওয়া অন্যায়।

আমি মাকে বোঝালাম, এতে অন্যায় কিছু নেই। আমাদের যে টাকা পাওনা আছে ক্যাপ্টেনের কাছে, আমরা শুধু তাই নেব। বাকীটা রেখে দেব।

মা শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন।

মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি গাঁয়ের মধ্যে চলে গেলাম। রাত দশটায় ওই সব ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষ এলে ওদের মোকাবিলা করবার জন্যে গাঁয়ের কিছু মানুষের সাহায্যের দরকার।

আমি কিছু লোক জোগাড় করবার জন্যে গাঁয়ের মধ্যে চলে গেলাম। আর গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে গাঁয়ের লোকের মুখে যা শুনলাম, তাতে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।

বাবার অসুখের জন্যে এবং অন্যান্য কারণে আমি অনেক দিন গাঁয়ের মধ্যে আসতে পারিনি। এদিকে যে এত কাণ্ড ঘটে গেছে আমি তো কিছুই জানি না।

সমুদ্রের মধ্যে একটা খাড়ি আছে কীটসহোল তার নাম। সেই খাড়িতে একটা জাহাজ কদিন নোঙর করে আছে। ওটা নাকি জলদস্যুদের জাহাজ। ওই জাহাজে সব গুণ্ডা প্রকৃতির লোক দেখা গেছে। একটা কানাঘুষা শোনা গেছে, ওদের লক্ষ্য নাকি আমাদের হোটেলটা।

গাঁয়ের লোকদের অনেক অনুরোধ করলাম। কিন্তু কেউ আমাদের হোটেলে আসতে রাজী হল না।

ওরা উলটে বলল যে মা এবং অন্যান্য মালপত্র নিয়ে আমরা যেন হোটেল ছেড়ে গাঁয়ের মধ্যে আশ্রয় নি।

আমি খুব হতাশ হয়ে ডাক্তার লিভোসীর বাড়িতে গেলাম। তিনি এ অঞ্চলের ম্যাজিষ্ট্রেট। পুলিশ তাঁর কথা শোনে। তিনি যদি রাত দশটার মধ্যে পুলিশ পাঠিয়ে আমাদের রক্ষা করেন। ডাক্তার লিভোসীকে অনুরোধ করে আমি আবার ফিরে এলাম।

মা আমার জন্য আকুল হয়ে বসে ছিলেন। মাকে সব কথা বললাম।

এখন সন্ধ্যে সাতটা বাজে। হাতে এখনও তিন ঘণ্টা সময়।

এর মধ্যেই সিন্দুক খুলে টাকাকড়ি বের করে নিতে হবে।

সিন্দুক তো খুলব। কিন্তু চাবি কোথায় ?

ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ হাতড়ে কোমরের সঙ্গে ফিতেয় বাঁধা একটা চাবি পেয়ে গেলাম।

সেই চাবি দিয়ে সিন্দুকটা খোলা হল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল উগ্র একটা গন্ধ।

ভিতরে হাত ঢুকিয়ে প্রথমে পেলাম একটা সুন্দর পোশাক। এরপর একে একে বেরোতে লাগল তামাক, ছোটখাটো যন্ত্রপাতি, পিস্তল, রূপো, কম্পাস, ঘড়ি, আরও সব কি কি জিনিস।

কিন্তু সেই জিনিস কোথায় আমরা যা খুঁজছি ?

টাকা ?

অবশেষে পাওয়া গেল সেই টাকা। সামুদ্রিক লবণের থলেটা সরাতেই আর একটি থলে বেরিয়ে পড়ল। সেটা হাতে নিতেই ঝন ঝন শব্দ।

থলেটা মেঝের উপর উপুড় করতেই একরাশ মুদ্রা ছড়িয়ে পড়ল। আর সেইসঙ্গে অয়েল ক্লথে মোড়া ছোট্ট একটা বাক্স।

মুদ্রাগুলি ছিল নানা দেশের। স্পেন, ফ্রান্স, ইতালির মুদ্রা। এগুলো নিয়ে কোন কাজ হবে না। এর মধ্যে আমাদের দেশের কয়েকটা গিনিও ছিল। আমরা সেগুলো বেছে নিতে লাগলাম।

এই সময় বাইরে হঠাৎ দরজার উপর ঠক ঠক শব্দ।

কে যেন দরজার উপর লাঠি দিয়ে আঘাত করছে। সেই অন্ধ লোকটা নয়তো? দশটা বাজার এখনো দেরী আছে। হয়তো আগে ভাগে দেখতে এসেছে ক্যাপ্টেন পালাচ্ছে কিনা। ওদিকে দরজার উপর ঠক ঠক আওয়াজ বেড়েই চলেছে। ভয়ে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল।

যদি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে?

গিনি ভরা থলে আর সেই অয়েল ক্লথ মোড়া বাক্সটি নিয়ে মার হাত ধরে বললাম, মা এবার আমাদের পালাতে হবে। দরজার উপর লাঠির আঘাত শুনতে পাচ্ছো না?

—পালাবো কোন পথ দিয়ে?

—পিছনের ছোট্ট দরজাটা খুলে পালাতে হবে। চলো।

মায়ের হাত ধরে আমি হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

কুয়াশার জন্যে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

মা খুব দুর্বল। আমার সঙ্গে দৌড়তে পারছেন না।

তবু মাকে নিয়ে আমি অনেক দূর এগিয়ে গেলাম।

পথঘাট আমার নখদর্পণে। কোথায় গেলে নিরাপদে থাকা যাবে, তা আমার চেয়ে আর ভাল কে জানে।

মার হাত ধরে তাকে টানতে টানতে আমি ছুটলাম। এই সময় মা হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বুঝতে পারলাম, অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

কি আর করা যায়।

সামনে একটা সরু খাল। খালের উপর দিয়ে চওড়া পুল। নীচটায় বেশ লুকোনোর জায়গা।

আমি মাকে ধরে পুলের তলায় শুইয়ে দিলাম। খাল থেকে জল এনে মায়ের মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিলাম। মার জ্ঞান

ফিরে আসতে বললাম, মা তুমি এখানে থাকো। আমি একটু দেখে আসি ওদিকে কি হচ্ছে।

মা আমার হাত চেপে ধরলেন। যেতে দেবেন না।

আমি মাকে বললাম, কোন ভয় নেই মা। আমার কিছু হবে না। আমি দূর থেকে লুকিয়ে দেখবো।

মাকে বুঝিয়ে আমি ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে আবার হোটেলের কাছে ফিরে এলাম।

হোটেলের পাশেই একটা বেশ বড়সড় ঝোপ। তার আড়ালে বসে সব দেখতে লাগলাম।

অনেক লোক জমা হয়েছে আমাদের হোটেলের সামনে। ওদের মধ্যে সেই কানা লোক, ব্ল্যাক ডগ আর এক-ঠ্যাঙওয়ালাকে চিনতে আমার ভুল হল না।

ওরা খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল।

অন্ধ মানুষটি দেখলাম সবচেয়ে বেশী চেঁচামেচি করছে। মনে হল সেই এই দলের নেতা।

হঠাৎ দেখি সেই অন্ধ লোকটি বলছে, ভাঙো দরজা।

তিন চারজন সদর দরজায় ঘা দিতেই ভিতর থেকে খিল ভেঙে গেল।

দরজা খুলতেই ওরা সকলে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকল।

আমিও খরগোসের মতো পা টিপে টিপে ওদের অনুসরণ করলাম।

।। জলদস্যুদের আক্রমন ।।

ক্যাপ্টেনের ঘরেরসামনে গিয়ে ওরা থমকে দাঁড়াল। নীচু হয়ে কি দেখল।

কে একজন বলল, ক্যাপ্টেন তো মারা গেছে পিউ। তুমি যে বললে—

—মারা গেছে। অন্ধ লোকটি হাতের লাঠিটা জোরে মেঝেতে ঠুকল, হতেই পারে না। আমি বিকেলেই ওকে জ্যান্ত দেখে গেছি।

—আমি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি, বিল মরে গেছে।

এবার গলাটা বোধহয় সেই ব্ল্যাক ডগের।

—মরে গেছে। বেশ হয়েছে। এবার ওর সিন্দুকটা খোল।

কয়েকজন হুড়দাড় করে সিন্দুকটার কাছে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, পিউ সিন্দুকটা খোলা।

—সিন্দুকটা খোলা! পিউ আর্তনাদ করে উঠল।

—হ্যাঁ খোলা, নীচে অনেকগুলো মুদ্রা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

—চুলোয় যাক মুদ্রা। সেই ম্যাপ কোথায়? খোঁজ সেই ম্যাপ।

আবার কয়েকজন সিন্দুক হাতড়াতে লাগল।

—ম্যাপ নেই।

—ম্যাপ নেই। পিউ যেন পাগল হয়ে গেল। পাগলের মতো হাতের লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, ম্যাপ খোঁজ। যে করেই হোক, ম্যাপ খুঁজে বের করা চাই। চাই চাই চাই।

এর পর আরম্ভ হল দাপাদাপি। আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম, জলদস্যুরা সকলে আমাদের হোটেলের ঘর তছনছ করতে লাগল। বালিশ তোষক ছিঁড়ে ফালা ফালা করল। মেঝে খুঁড়ল। আলমারির পাল্লা ভাঙল। কয়েকটা দেয়ালও ফাটিয়ে ফেলল।

পিউ চোখে দেখতে পায় না।

মিনিটে মিনিটে সে খোঁজ নিচ্ছে—পাওয়া গেল? পাওয়া গেল ম্যাপ?

আর প্রতিবারই সে শুনছে, না পাওয়া যায় নি।

রাগে ক্ষোভে পিউ চুল ছিঁড়তে লাগল, এ হচ্ছে সেই শয়তান বিচ্ছু ছেলেটার কাজ। ওই ম্যাপ সরিয়েছে। ওকে পেলে ওর চোখ দুটো আমি উপড়ে নেবো। পাওয়া গেল ম্যাপ?

—না।

—উঃ। ওই ম্যাপের মধ্যে আছে রত্নদ্বীপের হদিশ। রত্নদ্বীপে যেতে পারলে চৌদ্দ পুরুষ পায়ের উপর পা তুলে বসে খেতে পারবো।

এমন সময় বাইরে বাঁশীর শব্দ শোনা গেল।

—পুলিশ। পুলিশ।

—চুলোয় যাক পুলিশ। ম্যাপ না নিয়ে আমি যাবো না।

—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে পিউ। পুলিশে ধরলে সবশুদ্ধ মারা পড়বো। পালাও এবার।

—এ্যাই জনি, পিউ বিকট স্বরে চেঁচিয়ে বলল, আমি সকলকে খুন করে ফেলবো। ম্যাপ আমার চাই।

বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ খুব কাছে। আমি তাড়াতাড়ি পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখলাম, একদল পুলিশ ঘোড়ায় চড়ে আসছে।

দস্যুদল হুড়মুড় করে পালিয়ে যাচ্ছে।

ওদের পিছনে পিউ। ও চোখে দেখতে পায় না। ছুটতে পারবে কেন? একটা গর্তের মধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

আর ওর উপর দিয়ে পুলিশের ঘোড়াগুলো হোটেলের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

এদিকে পিউয়ের তখন কি প্রাণ ফাটানো আর্ত চীৎকার। এতগুলো ঘোড়া ওর শরীরের উপর দিয়ে চলে গেছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ওর শরীরটা স্থির হয়ে গেল।

পুলিশ এলে আমি সব কথা খুলে বললাম ইনসপেক্টরকে। কয়েকজন পুলিশ নিয়ে প্রথমে গেলাম সেই পুলের নীচে।

মাকে নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে।

তারপর গেলাম ডাক্তার লিভোসীর বাড়িতে। জলদস্যু পিউ মারা গেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে ডাক্তারবাবু যা করবার করবেন।

Acc. No. — 14657

এর পর যাওয়া হল জমিদার ট্রিলনীর বাড়িতে। ট্রিলনীও ম্যাজিষ্ট্রেট। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা।

তার কাছেও সব খুলে বললাম।

ট্রিলনী বললেন, জলদস্যুরা যে ওই ম্যাপটার জন্যে তোমাদের হোটেলের উপর চড়াও হয়েছে, এ তো পরিষ্কার। কিন্তু কি আছে সেই নক্সাটায় ?

ডাক্তার লিভোসী বললেন, কোন রত্ন ভাণ্ডারের হদিশ আছে নিশ্চয়।

—কোথায় সেই ম্যাপ ?

—আমার কাছে। এই বলে পকেট থেকে সেই ছোট্ট থলেটা বের করে আমি তার মুখ খুলে ফেললাম।

বেরিয়ে পড়ল একটা ডায়েরী আর ভাঁজ করা একটা কাগজ।

এই সেই ম্যাপ যার জন্যে ক্যাপ্টেন আর পিউয়ের মৃত্যু হল।

॥ রত্নদ্বীপের ম্যাপ ॥

ডাক্তার লিভোসী ডায়েরীখানা টেনে নিলেন।

বাঁ দিকে তারিখ। আর ডান দিকে টাকার অঙ্ক লেখা।

মাঝে মাঝে ক্রশ চিহ্ন বসানো। কোথাও একটা, কোথাও ছুটো, কোথাও ছয় সাতটা।

মাঝে মাঝে কোন জায়গার নাম লেখা। আর দ্রাঘিমা নিরক্ষ রেখার নানা সংখ্যা।

ডায়েরীর প্রতি পাতায় টাকার অঙ্ক। শেষ পাতায় সেই অঙ্কগুলো যোগ দেওয়া হয়েছে। আর নীচে লেখা আছে বিল বোনস-এর টাকা।

ডায়েরীখানা ভাল করে নেড়ে চেড়ে ডাক্তার লিভোসী বললেন, ভালো করে কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।

এবার ট্রিলনী ডায়েরাখানা নিয়ে খুব মন দিয়ে দেখলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, উঃ। সেই শয়তান ক্যাপ্টেনটা কত জায়গায় না লুটপাট করেছে।

ডাক্তার লিভোসী বললেন, কি করে বুঝলেন ?

—বুঝলাম ক্রশ দেখে। যে সব জায়গায় লুটপাট চালিয়েছে সেইসব জায়গার নাম না দিয়ে ক্রশ বসিয়েছে। এই যে টাকার অঙ্কগুলো দেখছেন। এগুলো সব এক এক জায়গায় লুটপাট করে পাওয়া টাকা।

—আর দ্রাঘিমা নিরক্ষরেখার সংখ্যা ?

ওগুলো দূরত্বের চিহ্ন। এই যে দেখছেন লেখা আছে—'ক্যারাকাসের কাছে'—তার মানে হচ্ছে—ক্যারাকাসের কাছে যে জাহাজে লুটপাট করছিল, তার বিবরণ।

—এবার ম্যাপখানা পরীক্ষা করা যাক।

ম্যপটার ভাঁজ খুলতে দেখা গেল—ওটা একটা দ্বীপের ম্যাপ।

এই ম্যাপে দ্বীপটার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। নয় মাইল লম্বা পাঁচ মাইল চওড়া এই দ্বীপ। দুদিকে দুটি পোতাশ্রয়। মাঝখান দিয়ে একটা পাহাড় চলে গেছে। ম্যাপের উত্তর দিকে দুটো ক্রশচিহ্ন আর দক্ষিণ পশ্চিমে একটা ক্রশ চিহ্ন। এর নীচে লেখা—গুপ্তধন।

সেই দ্বীপে কোন পথ দিয়ে যাওয়া যায়, তা-ও সব লেখা আছে ম্যাপটার মধ্যে।

ডাক্তার লিভোসী বললেন, ছাখো তো ম্যাপটার পিছন দিকে কি সব লেখা আছে।

ট্রিলনী পড়লেন—

লম্বা খাদ, পাহাড়ের উত্তর পূর্বে কংকন দ্বীপ - পূর্বে ও দক্ষিণ পূর্বে—দশ ফুট—ছপা উত্তর গর্তে—অস্ত্রভাণ্ডার—বেলে পাহাড়ে—অন্তরীপের উত্তর পূর্বে।

নীচে একটা নাম লেখা—জে ফ্লিন্ট।

—ফ্লিণ্ট ? ট্রিলনী প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, কার নাম লেখা আছে বলছো ?

—জে ফ্লিণ্ট ।

—কি সর্বনাশ। ও তো সমুদ্র এলাকার সব চেয়ে কুখ্যাত জলদস্যু। ওরকম দুঃসাহসী হিংস্র জলদস্যু আর দ্বিতীয়টা জন্মায় নি।

—বেঁচে আছে এখনও ?

—নাঃ। মারা গেছে। কিন্তু ম্যাপের পিছনে ওর নাম লেখা কেন ? দাও তো ম্যাপটা আমার হাতে।

ট্রিলনী ম্যাপটা নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন। বললেন, এবার সব বুঝতে পেরেছি। সামনে এটা ফ্লিণ্টেরই ম্যাপ। ক্যাপ্টেন, পিউ, ব্ল্যাক ডগ প্রভৃতি জলদস্যুরা ফ্লিণ্টের দলেই ছিল। ফ্লিণ্ট মরবার পর ক্যাপ্টেন এই নক্সাটা হাতিয়ে সরে পড়ে। চুপি চুপি আশ্রয় নেয় রেনবো হোটেলে। ওদিকে অন্য জলদস্যুরা ওর খোঁজ করতে করতে এখানে চলে আসে। তার পরের ঘটনা তো সব জানা।

—ওরাও তাহলে এই গুপ্তধনের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে ?

—নিশ্চয়ই। ট্রিলনী বললেন, এই নক্সা হাতিয়ে ওরা সেই নির্জন দ্বীপে গিয়ে গুপ্তধন হাতিয়ে নিতে চায়। সেই জন্যই এত আয়োজন। কিন্তু গুপ্তধন আমরা ওদের দেব না।

—কিন্তু ওরা তো যে ভাবেই হোক নক্সা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে।

—তা তো করবেই। তবে তার আগে আমাদেরই ওই দ্বীপে গিয়ে গুপ্তধন দখল করে নিতে হবে। আমি তুমি ও জিম—এই তিনজন ভাগাভাগি করে নেবো। কি জিম, রাজী তো ?

—নিশ্চয়। আমি সোৎসাহে বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে সব জায়গায় যেতে রাজী।

—তোমার মতো একটা বুদ্ধিমান সাহসী ছেলে থাকলে এ গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারব।

এরপর তিনজনে চুপি চুপি অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করলাম।

ট্রিলনী প্রিষ্টন বন্দরে গিয়ে একটা জাহাজ কিনবেন। সেই জাহাজে চড়ে আমরা যাত্রা করবো রত্নদ্বীপের উদ্দেশ্যে। ডাক্তার লিভোসী হবেন জাহাজের ডাক্তার। আর আমার পরিচয় হবে ওদের খানসামা। ট্রিলনী নিজের বাড়ি থেকে তিনজন অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য নিয়ে যাবেন। তাদের নাম রেডরুথ, জয়েস আর হাণ্টার।

জাহাজ কেনার পর ক্যাপ্টেন আর নাবিকের দল ঠিক করা হবে। গুপ্তধনের কথা কেউ জানবে না। সকলকে বলা হবে, আমরা একটা নূতন জায়গায় যাচ্ছি। কাকপক্ষীও জানবে না আমাদের আসল উদ্দেশ্যের খবর। ট্রিলনীর এত উৎসাহ দেখে ডাক্তার লিভোসী একটু ঘাবড়ে গেলেন।

বললেন, ব্যাপারটা যথেষ্ট গোপন রাখতে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তুমিই অতি উৎসাহে ব্যাপারটা ফাঁস করে দেবে।

—আরে না না। এ সব ব্যাপারে আমি অত্যন্ত সিরিয়াস। আমি কালই চলে যাচ্ছি প্রিষ্টনে। সব জোগাড় যন্তর করেই তোমাকে খবর দেব। আমি খবর পাঠানো মাত্র তুমি আর জিম চলে আসবে। আমি জিমকে কিছু টাকা দিয়ে যাচ্ছি। সেই টাকা দিয়ে হোটেলটা মেরামত করে আবার চালু করে দিক। ওর মা দেখাশুনা করবে। আমি একটা বিশ্বাসী লোকও দিয়ে দেব।

এরপর যে যার বাড়ি ফিরে গেলাম।

॥ রত্নদ্বীপের উদ্দেশে ॥

ট্রিলনী প্রিষ্টনে চলে গেলেন সব জোগাড় যন্তর করতে। কিছুদিন পর তাঁর চিঠি পেয়ে আমি ডাক্তার লিভোসীর সাথে চলে গেলাম প্রিষ্টনে। সেখানে গিয়ে দেখলাম হৈ হৈ কাণ্ড।

ট্রিলনী বেশ সুন্দর একখানা জাহাজ কিনেছেন। জাহাজটির নাম হিমপ্যানিওয়ালা।

শুনলাম নাবিক জোগাড় করতে নাকি খুব বেগ পেতে হয়েছিল প্রথমটায়। শেষটায় লং জন নামে একটা লোকের সাহায্যে তিনি কয়েকজন নাবিক জোগাড় করতে পেরেছেন।

লং জন খুব লম্বা। তার একটি পা নেই। জলদস্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে পা কাটা গেছে তার। ট্রিলনী তাকে জাহাজের পাচকপদে নিযুক্ত করেছেন।

লং জন খুব করিতকর্মা। তার পরামর্শে ট্রিলনী লোকজন বাছাই করেছেন। সে একজন ভালো মেট জোগাড় করে দিয়েছে। নাম অ্যারো। জাহাজের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করা হয়েছে স্মলেট নামে একজন অভিজ্ঞ মানুষকে। এই ক্যাপ্টেনকে এনে দিয়েছেন ট্রিলনীর বন্ধু ব্লাণ্ডলী। মানুষটি ভালো। তবে রগচটা।

ট্রিলনী আমাদের নিয়ে গেলেন জাহাজ দেখাতে।

সমুদ্রের মধ্যে নোঙর করা আছে আমাদের জাহাজ 'হিমপ্যানিওয়ালা'। আমরা নৌকা করে গিয়ে জাহাজে উঠলাম।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি একগাদা অভিযোগ পেশ করলেন ট্রিলনীর কাছে।

লং জন যে সমস্ত নাবিকদের যোগাড় করেছে, তাদের নাকি ভাল মনে হচ্ছে না তার। এ রকম করলে এখানে কাজ করে পোষাবে না।

ট্রিলনী জমিদার মানুষ। মেজাজী। তার এ রকম কথা শোনার অভ্যেস নেই।

তিনি একথা শুনে চটে বললেন, না পোষায় ছেড়ে দিন। আমি অন্য ক্যাপ্টেন জোগাড় করে নেবো। লং জন থাকতে আমার কিসের ভাবনা।

ক্যাপ্টেন স্মলেট কড়া ভাষায় কি বলতে যাচ্ছিলেন। ডাক্তার লিভোসী তাঁকে থামিয়ে বললেন, ক্যাপ্টেন স্মলেট, কিছু মনে করবেন

না। আপনার অভিযোগগুলো দয়া করে বলুন। আমরা যথাসম্ভব প্রতিকারের ব্যবস্থা করছি।

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, এক নম্বর হল, আমাকে এখন পর্যন্ত গন্তব্যস্থানের কথা বলা হয় নি। অথচ খবর নিয়ে দেখলাম, জাহাজের প্রতিটি নাবিক পর্যন্ত গন্তব্যস্থানের বিষয় জানে।

ডাক্তার চমকে উঠলেন, কি জানে?

—তারা জানে, এ জাহাজ যাবে গুপ্তধনের সন্ধানে একটা রত্নদ্বীপে। সে রত্নদ্বীপের অবস্থান সম্পর্কে এরা দেখলাম সমস্ত খোঁজ খবরই রাখে। এ সব কি ব্যাপার মশাই?

ট্রিলনী বললেন, কে বললো এসব কথা? আমি তো বলিনি।

ডাক্তার বললেন, তাহলে আমি বলেছি, কিংবা জিমও বলে থাকতে পারে।

ট্রিলনী বারবার লাগলেন, না না তা কি করে হয়—তা কি করে হয়। গুপ্তধন কিংবা রত্নদ্বীপের কথা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।
—কিন্তু সেই অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে। ডাক্তার বললেন, যাক্‌গে, যা হবার হয়ে গেছে। এখন কি করা যায় বলুন।

ক্যাপ্টেন স্মলেট তখন কয়েকটি পরামর্শ দিলেন।

তাঁর বক্তব্য : নাবিকদের যখন নিয়োগ করা হয়ে গেছে, তখন তারা সহজে যাবে না। তারা কি রকম প্রকৃতির তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। অতএব আগে থাকতেই সাবধান থাকতে হবে। কেবিনের নীচে যে ঘর আছে সেখানে অস্ত্র মজুত করে রাখা হবে।

সেই ঘরের কাছাকাছি থাকবো আমরা ছয়জন—আমি, ডাক্তার, ট্রিলনী, রেডরুথ, জয়েস আর হাণ্টার।

নাবিকেরা যদি হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তবে তারা যাতে একটা অস্ত্রও না পায়, সেইজন্যে এই ব্যবস্থা।

অস্ত্র হাতে না পেলে তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না, এবং

তাদের সহজেই কাবু করে ফেলা যাবে। এই ব্যবস্থা সকলেরই পছন্দ হল।

যাত্রার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।

বহু টাকার অস্ত্রশস্ত্র কেনা হল। খাদ্যদ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হল।

ট্রিলনীর বন্ধু মিষ্টার ব্লাণ্ডলী খুব ভালো মানুষ। তিনি অনেক সাহায্য করলেন।

তাঁকে বলা হল যদি আগষ্টের মধ্যে আমরা না ফিরে আসি, তবে তিনি যেন আমাদের খোঁজে দ্বিতীয় আর একটি জাহাজ পাঠান।

অবশেষে যাত্রার দিন এসে গেল।

জাহাজের বাঁশী বেজে উঠল। নাবিকের দল ক্যাপষ্টানের হাতল ধরে ঘোরাতে লাগল। জলের নীচে মাটিতে পড়ে আছে ভারী নোঙর।

ক্যাপষ্টানের ঘোরার সাথে সাথে নোঙর আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসছে।

লং জন এক পাশে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। সে নাবিকদের গান ধরল—

মরা মানুষের বাক্সে
পনেরোটা নাবিক ভাসে
হো হো হো

গানটা শুনে আমি চমকে উঠলাম। আরে। এ তো সেই গান যা ক্যাপ্টেন বিল অনবরত গাইত।

যাত্রাসূচক বাঁশী বাজিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমাদের জাহাজ সমুদ্রের বুকে ভেসে চলল রত্নদ্বীপের উদ্দেশে।

আমাদের জাহাজ এখন সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে জল কেটে এগিয়ে চলেছে। চারধারে শুধু জল আর জল। নীল অনন্ত জলরাশি। আমরা থাকি আমাদের মতো। নাবিকরা থাকে ওদের মতো।

লং জন জাহাজের পাচক হলে কি হয়, ওই দেখছি, নাবিকদের সর্দার। ওর একটা পা উরুর উপর থেকে কেটে বাদ দেওয়া। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সে লাঠি নিয়ে স্বচ্ছন্দে সব জায়গায় চলাফেরা করে। সকলের উপর খবরদারী করে। নাবিকের দল ওকে ভীষণ মানে। ওদের মধ্যে ফিসফিস করে কি সব আলোচনা হয়। নাবিকেরা ওকে আড়ালে 'বারবেকু' বলে ডাকে।

এই লং জনকে নিয়ে আমার এখন ভাবনা। ক্যাপ্টেন হোটেলে এসেই আমাকে এক-ঠ্যাঙওয়ালা লোকটা আসে কিনা লক্ষ্য রাখতে বলেছিল।

এই কি সেই এক ঠ্যাঙওয়ালা লোক? কে জানে। জলদস্যুরা তো খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। আর খুব রুক্ষ। কিন্তু লং জন তো খুব আমুদে প্রকৃতির।

আমাকে দেখলেই হেসে কথা বলে। আমাকেও ও মালিকদের একজন মনে করে।

কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। ভাঁড়ার ঘর থেকে ভালো ভালো খাবার বের করে আমাকে খেতে দেয়।

লং জনের কথাবার্তা শুনে আর চালচলন দেখে মোটেই খারাপ লোক মনে হয় না আমার।

আমার মনে কেন যেন একটা বিশ্বাস জন্মেছে যে লং জন সম্পূর্ণ অন্য লোক।

সেই 'এক-ঠ্যাঙওয়ালা মানুষ' নয়।

লং জনের একটা পাখি আছে, বেশ সুন্দর পাখি। নাম তার ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট।

আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, পাখির অমন নাম রেখেছো কেন ?

লং জন বলল, ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্ট কে ছিল জানো ? এই এলাকার জলদস্যুদের নেতা। এই যে আমার পাখিটা দেখছো, এটির মালিক ছিল ওই ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্ট।

—তুমি এটি কোথায় পেলে ?

—পেলাম এক জায়গা থেকে। এই পাখিটার বয়স কত হল বলো তো।

—কত আর হবে ? পাঁচ ছয় বছর।

—তোমার মাথা খারাপ। এর বয়স অন্তত দুশো বছর। ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের অসংখ্য ডাকাতির ও সাক্ষী। ফ্লিণ্টের সঙ্গে ও বহু জায়গা ঘুরেছে।

—ও সব সময় 'আট মোহরী' বলে চেঁচায় কেন ?

—আরে সে এক গল্প। সেলনের মোহর বোঝাই জাহাজ সব সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল। সেই জাহাজগুলিতে ছিল সাড়ে তিন লক্ষ আট মোহরী গিনি। জাহাজগুলি জল থেকে তোলার সময় পাখিটা সেখানে ছিল। লোকের মুখে 'আট মোহরী' কথাটা শুনতে শুনতে কথাটা ওর মুখস্থ হয়ে গেছে। চল যাই দেখি পাখিটা কি করছে।

খাঁচায় ঝোলানো ছিল পাখিটা। আমাদের দেখেই কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, সরে যাও—ঘুরে যাও। মনে হল, সেই মৃত জলদস্যু যেন সত্যি সত্যি কর্কশ কণ্ঠে নাবিকদের জাহাজ ঘোরাবার আদেশ দিচ্ছে।

লং জন পাখিটাকে খেতে দিল।

খেতে খেতে পাখিটা আবার চেঁচাতে শুরু করল।

আমাদের জাহাজ সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে কোন অজানা দ্বীপের উদ্দেশে। চারদিকে শুধু জল আর জল। মাঝে মাঝে দু একটা বন্দরের আভাস। ঘরবাড়ি—চিমনীর ধোঁয়া। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তা মিলিয়ে যায়। জাহাজ ভেসে চলে

আপন গতিতে। এই সমুদ্রের উপর দিয়ে কিভাবে পথ চিনে এগিয়ে যাচ্ছে, তা একমাত্র ক্যাপ্টেন স্মলেটই জানেন।

ক্যাপ্টেন স্মলেট গম্ভীর রাশভারী স্বভাবের মানুষ। জমিদার ট্রিলনী এ জাহাজের মালিক। কিন্তু ক্যাপ্টেন স্মলেট তাকেও বিশেষ পাত্তা দিতে চায় না। ট্রিলনী দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। তিনি নিজে বেশ ফুর্তিবাজ। খাওয়া-দাওয়া লোকজনের সঙ্গে গল্প-গুজব তাঁর খুব ভালো লাগে।

ক্যাপ্টেন স্মলেট আবার এগুলো পছন্দ করে না। তাই তার সঙ্গে ট্রিলনীর বিশেষ বনিবনা হয় না। ক্যাপ্টেনের ভাবখানা এই রকম : তুমি এ জাহাজের মালিক হও আর যাই হও তাতে আমার কি। আমি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন, জলের উপর আমিই এর আসল মালিক।

এর মধ্যে একদিন খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল। ঢেউগুলো ঝড়ের বেগে পাহাড়ের সমান হয়ে ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগল। ঢেউ-এর উপর জাহাজটা দুলতে লাগল ঠিক মোচার খোলার মতো। ডেকের উপর জল উঠে এল। কিন্তু স্মলেটের আশ্চর্য দক্ষতা। তিনি কি কৌশলে জাহাজটাকে সেই ভীষণ ঢেউ-এর মধ্যে ভালোভাবে চালিয়ে নিয়ে এলেন। ঝড়ের সময় তিনি উপরে উঠে কি সব নির্দেশ দিচ্ছিলেন। নাবিকের দল সেই অনুযায়ী কাজ করছিল। এর মধ্যে সেই অ্যারোকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঝড়-বৃষ্টির সময় মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে কোথায় পড়েছিল।

সমুদ্রের জলে পড়ে গেছে কোন সময়।

ক্যাপ্টেন স্মলেট এ বিষয়ে বেশ নির্বিকার। একটা লোক যে বেপাত্তা, তার সম্পর্কে তার মনে কোন ভাবনাই নেই। শুধু ক্যাপ্টেন কেন, সেই অ্যারো সম্পর্কে নাবিকদের মনেও কোন দুঃখ দেখলাম না। একজন সহকর্মী হারিয়ে গেল, অথচ তারা হৈ চৈ করে করে মদ খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। এ জাহাজে নাবিকদের

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা খুব সুন্দর। জমিদার ট্রিলনী উদারভাবে তাদের খাওয়া-দাওয়া পান ভোজনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রুটি মাখন মাংস যে যত খুশি খেতে পারে। তাদের দেওয়া হয় ঝুড়ি ভর্তি আপেল।

ক্যাপ্টেন স্মলেট এসব ব্যাপার একেবারে পছন্দ করেন না। তাঁর বক্তব্য : নাবিকদের সব সময় একটা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে হবে। যখন তখন তাদের জন্য যদি খাবার আয়োজন করা হয়, তবে শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। এ রকম হতে থাকলে তারা যখন তখন ভালো ভালো খাওয়া পরা চাইবে, আর তা না পেলেই ক্ষেপে যাবে। ট্রিলনী এসব যুক্তি মানতে চান না।

তাঁর বক্তব্য : নাবিকদের খুশি রাখাই আমাদের কর্তব্য। ওরা যদি খুশি হয়ে কাজ করে তবে কোন গোলমাল হবে না। আমরা তাড়াতাড়ি রত্নদ্বীপে পৌঁছোতে পারব।

আর যদি মাঝপথে কোন ঝামেলা বেধে যায়, তবে সব যাবে ভেস্তে।

ওদের দুজনের খিটিমিটির মধ্যে দিয়ে জাহাজ এগিয়ে চলে।

দিনের পর দিন কেটে যায়। চারধারে শুধু নীল জল।

রত্নদ্বীপ আর কত দূর ?

॥ চক্রান্তের জাল ॥

একদিন রাতের বেলা আমি ডেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে উপরের ডেকে চলে গেলাম।

ডেকের উপর প্রকাণ্ড আপেলের ড্রাম। এর মধ্যেই আপেল রাখা হয়। আপেল খাওয়ার জন্যে হাত নামালাম ড্রামের মধ্যে। আপেল পেলাম না। নীচের দিকে আপেল থাকতে পারে এই আশায় আমি নেমে গেলাম ড্রামের মধ্যে।

ড্রামের নীচের দিকটায় খড় বিছানো বিছানার মতো। আমি সেখানে বসে বসে কয়েকটা আপেল খেলাম। আপেল খেয়ে পেট ভরে গেল। চোখে বেশ ঘুম ঘুম ভাব। আমি সেই খড় বিছানো বিছানার উপর শুয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, ঘুম ভেঙে গেল কয়েকটি মানুষের কণ্ঠস্বরে। ড্রামের বাইরে কয়েকজন মানুষ কথা বলছিল। আমি কান পেতে শুনতে লাগলাম প্রতিটি কথা।

লং জনের গলা শুনে চিনতে পারলাম। সে বলছিল, ওসব ভাগ্য-টাগ্য আমি মানি না। আমার কথা—ভাগ্য আমি নিজে তৈরী করে নেবো। এই আমার জীবনটার কথাই ধর না কেন। ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের জাহাজে বেশ ভালোই ছিলাম আমরা। কোন রকম বিপদ হয়নি। সেবার সরকারী জাহাজ আমাদের পিছু লাগল। কামান দেগে গোলা ছুঁড়তে লাগল আমাদের জাহাজ লক্ষ্য করে। আমার একখানা ঠ্যাঙ উড়ে গেল। পিউ-এর গেল চোখ জোড়া। তা পা গেলে সবাই তো কাজকর্ম ছেড়ে বাড়িতে বসে থাকে, আমি কি চুপচাপ বাড়িতে বসে রইলাম নাকি। আমার ভাগ্য আমি নিজেই গড়ে নিলাম আবার।

এবার ডিক নামে এক নাবিকের গলা, কি করে গড়লে?—কেন, টাকা পয়সা যা জমিয়েছিলাম তাই দিয়ে ব্রিষ্টলে একটা হোটেল খুললাম। হোটেল চালায় আসলে আমার বউ। আমি নতুন কিছু করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। তারপর সুযোগ আসতে—

—সুযোগটা এল কি করে?

—সুযোগটা আসলে করে দিল কানা পিউ। লং জন বলল, ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট ওকে অনেক টাকা দিয়েছিল। ও লাট সাহেবের মেজাজে সেগুলো খরচ করে দু দিনেই ফকির হয়ে পড়ল। শেষটায় রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতো। আমি একদিন বললাম যে বিল বোনস-এর কাছ থেকে যদি রত্নদ্বীপের ম্যাপখানা উদ্ধার করে আনতে

পারে তাহলে আবার রাজা হয়ে যাবে। ডিক বলল, বিল বোনস-এর কাছে ম্যাপ গেল কি করে ?

লং জন বলল, ওটা মহা শয়তান। ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট মারা যাবার পর ওই তো ম্যাপটা কিভাবে হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়েছিলো। আমি সেই সময় দলে থাকলে কি সরাতে পারতো ? হতভাগা ভেবেছিল একা একা রত্নদ্বীপে গিয়ে রত্নভাণ্ডারের মালিক হয়ে বসবে। হুঃ। অত সোজা ? এসব কাজে সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে এগোতে হয়। পিউটা তো গোঁয়াতুর্মি করতে গিয়েই মরল।

ডিক বলল, পিউ তো অনেকটা কাজ করে রেখে গেছে।

লং জন বলল, তা গেছে। ও রত্নদ্বীপের কথা বলে তোদের মতো কয়েকজনকে জোগাড় করে হোটেল রেনবোতে বিলের কাছ থেকে ম্যাপ হাতাতে গিয়েছিল। আমাকেও বলেছিল সঙ্গে যেতে। আমি যাইনি।

—যাওনি কেন ?

—আরে, আমি কি অত কাঁচা ছেলে নাকি ? আমি মনে মনে ছকে রেখেছিলাম, পিউ কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখুক, আমি বাকীটা শেষ করব। আমি জানতাম, কোন না কোন বড়লোক জাহাজ ভাড়া করে রত্নদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে, আর সেই সময় আমি তার মাথায় কাঁটাল ভাঙবো।

—কি করে ?

সে সব প্ল্যান আমি ঠিক করে রেখেছি। রত্নদ্বীপের রত্নভাণ্ডার জাহাজ বোঝাই করে ট্রিলনীর দল যখন ফিরে আসবে, তখন মাঝপথে আমি সবাইকে খতম করবো।

—খতম তো করবে, কিন্তু পুলিশ তো ধরতে পারলে তোমাকে ফাঁসীকাঠে চড়াবে।

—পুলিশ ? ফুঃ। ধরতে পারলে তো। আমি ব্রিষ্টলে ফিরছি নাকি। আমার বউকে বলা আছে। সে হোটেল এর মধ্যে বিক্রি

করে দিয়ে একটা অজ্ঞাত জায়গায় চলে যাবে। আমিও সেখানে চলে যাবো। ব্যস, তারপর তো রাজা। এই সময় আর একজন কে সেখানে এল।

গলা শুনে বুঝতে পারলাম জাহাজের সারেঙ্গ ইজরায়েল হ্যাগুস। লোকটার মাথা মোটা। গলা ভীষণ কর্কশ। গায়ে দৈত্যের মতো শক্তি। এসেই হেঁড়ে গলায় বলল, ও তোমরা এখানে আড্ডা জমিয়েছ। আর আমি তোমাদের খুঁজে মরছি।

লং জন চাপা গলায় বলল, এ্যাই চুপ চুপ। কি হয়েছে? অত খোঁজাখুঁজি কেন? ব্যাপার কি?

হ্যাগুস বলল, ওই ক্যাপ্টেন স্মলেটটার মাতব্বরী আর সহ্য হয় না। সব ব্যাপারেই শুধু মাতব্বরী। ইচ্ছে করে ব্যাটাকে ধাক্কা দিয়ে সাগর জলে ফেলে দি।

লং জন গম্ভীর কণ্ঠে বলল, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি ইজরায়েল। হঠকারিতা করতে যেও না। আমি চাই না, এই মুহূর্তে তোমরা জাহাজের কারো সঙ্গে গোলমালে জড়িয়ে পড়ো। ক্যাপ্টেন স্মলেটের প্রতিটি হুকুম তোমাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। চল আর না। কেউ শুনে ফেলতে পারে আমাদের কথা। ওরা ওখান থেকে চলে গেল। আমিও আপেলের ড্রাম থেকে বেরিয়ে এলাম।

ডাক্তার ও ট্রিলনীর কাছে সব কথা বলতে ওরা খুব সতর্ক থাকতে বললেন।

জাহাজ সমুদ্রের জলের উপর। এখন আর কিছু করার নেই। এখন ঝামেলা পাকিয়ে কোন লাভ নেই। নিজেরা সাবধান থাকলে ওরা কিছু করতে পারবে না। বিশেষ করে ওদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই তো নেই।

আমি বললাম, আমরা যখন রত্নগুলো জাহাজ বোঝাই করে ফিরে যাবো, তখন তো ওরা আমাদের আক্রমণ করবে ঠিক করেছে।

ট্রিলনী বললেন, আক্রমণ করার আগেই আমরা ওদের কাবু করে ফেলবো।

ডাক্তার লিভোসী বললেন, ব্যাপারটা সত্যি চিন্তার বিষয়। বলতে গেলে শত্রুদের আমরা পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিচ্ছি রত্নদ্বীপে। কিন্তু কিছু তো এক্ষেত্রে করার নেই। তবে ওদের দিয়ে আমাদেরও কাজ উদ্ধার করে নিতে হবে। নাবিক হিসাবে ওরা ভালোই। ওদের দিয়ে জাহাজ চালিয়ে আমাদের পৌঁছাতে হবে রত্নদ্বীপে।

ট্রিলনী বললেন, মাষ্টার জিম, তুমি খুব বুদ্ধিমান। তুমি আড়াল আবডাল থেকে ওদের উপর সব সময় লক্ষ্য রেখো। ওরা কি বলে, বা ওরা কি করে সব তোমাকে জানতে হবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

সেই দিন থেকে আমার কাজ হল ওদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা।

কাজটা খুব শক্ত। জানতে পারলে আমার গলা টিপে সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে এক মুহূর্ত দেরী করবে না ওরা।

তবু আমি সুযোগ খুঁজতে লাগলাম ওদের কথাবার্তা শুনবার।

মরি তো মরব। মানুষ তো একবারই মরে।

এই ধরনের বিপজ্জনক কাজ আমার ভালো লাগে।

।। ওই সেই রত্নদ্বীপ ।।

এরপর থেকে আমার কাজ হল লং জনের প্রতি লক্ষ্য রাখা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, লং জনই হলো ওদের সর্দার। লং জনের নির্দেশ অনুসারে ওরা কাজ করে। তাই আমি লং জনের কথাবার্তা শোনবার জন্য সব সময় চেষ্টা করতাম।

এদিকে আমাদের জাহাজ দিনের পর দিন সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। নীল জল দেখতে দেখতে মনের মধ্যে এসে গেছে

বিরক্তি। চারধারে তাকিয়ে তীরের কোন চিহ্নও চোখে পড়ে না। আমার মতো অবস্থা সকলেরই।

ক্যাপ্টেন স্মলেটের সঙ্গে ট্রিলনী ও ডাক্তারের এ নিয়ে কথাবার্তা হল।

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, ম্যাপে যদি কোন গোলমাল না থাকে, তাহলে জাহাজ ঠিক পথেই চলছে।

—কিন্তু ক্রমশই যে দুর্গম সমুদ্র অঞ্চলে আমরা ঢুকে পড়ছি।

ট্রিলনী বললেন, রত্নদ্বীপের আভাসমাত্র চোখে পড়ছে না।

—রত্নদ্বীপ কি লোকালয়ের কাছাকাছি থাকবে আপনি বলতে চান, ক্যাপ্টেন কড়া জবাব দিলেন, ফ্লিন্ট ছিলেন সুদক্ষ ক্যাপ্টেন, তিনি লোকালয় থেকে বহু দূরে নির্জন দ্বীপই বেছে নিয়েছিলেন আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

—আরে রাখুন আপনার বাজি। ট্রিলনী বললেন, আপনি দয়া করে তাড়াতাড়ি আমাদের রত্নদ্বীপে নিয়ে চলুন।

—আরে উনি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, ডাক্তার বললেন, ধৈর্য হারালে কি চলে! তারপর মাষ্টার জিম, নতুন কোন খবর পেলে?

—না। আমি মাথা নেড়ে বললাম।

ডাক্তার বললেন, আমি তোমাকে একটা খবর দিতে পারি। উপরের ডেকে একজন নাবিকের অসুখ করেছিল। ওষুধ দিয়ে আসবার সময় ইঞ্জিনঘরের সামনে আমি সারেঙ্গ ইজরায়েল আর লং জনকে উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলতে শুনলাম। ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো ব্যাপার কি। তবে খুব সাবধান।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পা টিপে টিপে ইঞ্জিনঘরের কাছে গেলাম। কয়লার অনেকগুলো বস্তা জড়ো করা ছিল। আমি তার মধ্যে ঢুকে ওদের কথা শুনতে চেষ্টা করলাম।

শুনলাম ইজরায়েল বলছে, এভাবে দিনের পর দিন আর চুপ করে

থাকতে পারি না। তুমি ওদের কাছ থেকে ম্যাপটা কেড়ে নেবার হুকুম দিচ্ছ না কেন তাই আমি জানতে চাই।

তুই একটা গাধা। লং জন রেগে বলল, ম্যাপ কেড়ে নিলেই হল। ওই ম্যাপ দেখে আমরা গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারবো? সে রকম সাধ্য আমাদের আছে?

—সাধ্য নেই কেন?

—আরে বোকা। ওই ম্যাপ দেখে কোনকালেই আমরা গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারবো না। ওসব ওই সাফ মাথাওয়ালাদেরই কাজ।

—তবে তুমি কি করতে চাও। এবার গলা ডিকের।

—আমি চাইছি ওই ডাক্তার আর ট্রিলনীর দলই খুঁজে বের করুক গুপ্তধন। ওগুলো জাহাজ বোঝাই করে ফিরে চলুক ইংলণ্ডের পথে। মাঝপথ পর্যন্ত আমরা কিছুই বলবো না। মাঝপথ পেরিয়ে গেলেই ধরব নিজ মূর্তি। তখন পাবি আমার হুকুম।

—মাঝপথ কেন? ডিক বলল, জাহাজে রত্ন বোঝাই করবার পর ওদের মেরে ফেললেই তো হয়।

—জাহাজ চালাবে কে?

—কেন আমরা।

—বোকা বুদ্ধি আর কাকে বলে। তোরা তো শুধু দড়িদড়া টানতে পারিস ক্যাপ্টেনের নির্দেশে। জাহাজ চালাতে শিখলি কবে। মনে রাখিস, ক্যাপ্টেন ছাড়া ঠিক মতো জাহাজ চালিয়ে নেবার সাধ্য কারো নেই। ওই ক্যাপ্টেন স্মলেটকে দিয়েই জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে মাঝপথ পর্যন্ত।

—তারপর কি করবে?

—তারপর ওদের একযোগে আক্রমণ করে জলে ফেলে দেবো। ধনরত্ন নৌকা বোঝাই করে কোন বন্দরে গা ঢাকা দেব।

—কি জানি বাপু, তোমার অত ঘোর প্যাঁচের লাইন আমার

ভালো লাগে না। যা করবে সোজাসুজি করাই ভালো। ইজরায়েল বলল।

—সোজাসুজি করাই ভালো। লং জন খেঁচিয়ে উঠল, সোজাসুজি করতে গেলে আর ধনী হয়ে পায়ের উপর পা তুলে বসে আরাম করা যাবে না। লাশ হয়ে সমুদ্রের জলে হাঙরের পেটে যেতে হবে।

—কেন? একথা বলছো কেন? ইজরায়েল গরম হয়ে বলে।

—বলছি কি আর সাধে। আমার এসব অনেক দেখা আছে। মাথা গরম করে কাজ করলে তার পরিণতি কি হয়, তা আমি খুব ভালোমতো জানি। ধনরত্ন পেয়েও শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে সবাই খুনোখুনি করে মরে।

—আমরা তো আগেই ভাগ বাটোয়ারা করে নেবো।

—ভাগ বাটোয়ারা করে তো নিবি। কিন্তু তোর ভাগ যে অন্যে কেউ নিতে চাইবে না এমন কোন গ্যারান্টি আছে? শোন আমি এসব ব্যাপার অনেক দেখেছি। টাকা পয়সা ভাগ হয়ে গেছে। তারপর নিজেরাই নিজেদের লোকজনকে মেরে ফেলেছে। টাকা আর কারো ভোগে লাগেনি। এরকম ভুল করবি তোরা?

—না—না। তুমি যখন বলবে তাই হবে।

—বাঃ বাঃ। এই তো চাই। লং জন খুশি হয়ে ডিকের পিঠ চাপড়ে দিল। এই সময় উপর থেকে চীৎকার শোনা গেল—তীর তীর—ওই যে তীর দেখা যাচ্ছে।

– মাস্তুলের উপর থেকে ওয়াচম্যানের গলা শোনা যাচ্ছে না? লং জন বলল।

—তাই তো। আমি যাই।

সারেঙ্গ ইজরায়েল ছুটে চলে গেল। ওর পিছন পিছন ডিক। লং জনও লাঠিতে ভর দিয়ে দেখতে চলে গেল। ওরা চলে যেতে আমিও কয়লার বস্তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে জামা প্যান্ট ঝেড়ে ঝুড়ে ডেকের উপর চলে এলাম। ডেকে ইতিমধ্যে সকলেই জড়ো হয়েছে।

সত্যিই। দূরে দেখা যাচ্ছে তীর। মাঝখান দিয়ে পাহাড়।

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, সত্যিই তো, ওটা তো কোন ছোট দ্বীপ মনে হচ্ছে। তোমরা এর আগে দেখেছো কেউ এই দ্বীপ?

লং জন বলল, আমি দেখেছি। আমি একটা বাণিজ্য জাহাজে পাচকের কাজ করতাম। জল নেবার জন্য জাহাজটি ওই দ্বীপে ভিড়েছিল। তখন দেখেছিলাম ওই দ্বীপ।

ক্যাপ্টেন বললেন, তাহলে তো কাছাকাছি জাহাজ নোঙর করা যাবে?

লং জন বলল, তা আছে। ওই দ্বীপের কাছাকাছি একটা খাড়ি আছে। সেখানে জাহাজ নোঙর করা যাবে।

—বাঃ। তুমি তো অনেক খবর রাখো। ওই দ্বীপের নাম কি?

—নাম কংকাল দ্বীপ।

—কংকাল দ্বীপ! ক্যাপ্টেনের স্বরে বিস্ময়।

—হ্যাঁ। ওখানে অসংখ্য নরকংকাল পাওয়া গিয়েছিল বলে ওই নাম দেওয়া হয়েছিল।

—অত নরকংকাল এল কি করে ওখানে?

শোনা যায়, জলদস্যুরা ওখানে মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতো। মাঝের ওই পাহাড়টার নাম দূরবীণ পাহাড়। ওখানে দাঁড়িয়ে দস্যুরা সমুদ্রের দিকে নজর রাখতো।

—তাহলে তো আমরা ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি। ক্যাপ্টেন স্মলেট পকেট থেকে একখানা ম্যাপ বের করলেন, এটা তো এই দ্বীপেরই ম্যাপ।

লং জন তাকিয়ে রইল সেই ম্যাপের দিকে। ওর চোখের মণি যেন বাঘের চোখের মতো জ্বলছে। পারলে সে কেড়েই নিতো ম্যাপখানা।

ক্যাপ্টেন স্মলেট মনে মনে হাসলেন। ম্যাপটা লং জনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ছাখো তো, এটা ওই দ্বীপটার ম্যাপ কিনা।

লং জন ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল ম্যাপখানা। দেখতে দেখতে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এল।

আসল ম্যাপের চেহারা ওর জানা আছে।

এ ম্যাপখানা আসল ম্যাপের নকল। এর মধ্যে দ্বীপটার বিবরণ আঁকা আছে। কিন্তু গুপ্তধনের কোন চিহ্ন দেওয়া নেই।

—কেমন? এই ম্যাপখানা তো?

—হ্যাঁ। এই ম্যাপটাই। বিবর্ণ মুখে ঘাড় নাড়ল লং জন।

—তাহলে আমরা এখানেই জাহাজ নোঙর করার ব্যবস্থা করছি। তুমি নাবিকদের খবর পাঠাও।

লং জন খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল।

ওর চলার মধ্যে আগেকার সে গতি আর নেই।

ক্যাপ্টেন স্মলেট আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

॥ নাবিকরা ক্ষেপে গেল ॥

কংকাল দ্বীপ কিন্তু রত্নদ্বীপ নয়।

কংকাল দ্বীপ আর রত্নদ্বীপের মাঝখানে আছে একটা বিশাল হ্রদের মতো জলাভূমি। সেখানেই জাহাজ নোঙর করা হবে।

ক্যাপ্টেন স্মলেট এ বিষয়ে খুব অভিজ্ঞ। তিনি ম্যাপ দেখে আগেই সব বুঝে রেখেছিলেন।

জাহাজ থেকে কয়েকটি বড়ো বড়ো নৌকা নামিয়ে দেওয়া হল। নৌকার সঙ্গে বাঁধা মোটা মোটা কাছি। নৌকাগুলি কাছির সাহায্যে জাহাজটাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

লং জন আছে সবচেয়ে আগের নৌকায়। সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটা জায়গায় এসে সে থামতে বলল। ক্যাপ্টেন স্মলেটকে সংকেত পাঠাল জাহাজ নোঙর ফেলবার জন্যে।

ক্যাপ্টেন স্মলেটের আদেশে জাহাজ নোঙর করা হল সেই হ্রদের মতো জায়গাটায়। এখান থেকে রত্নদীপ আধ মাইল দূরে। উপকূল বেশ সমতল মনে হচ্ছে। দূরে পাহাড়ের লাইন।

জাহাজ নোঙর করার পর আমরা আবার সবাই জাহাজে উঠে এলাম। নাবিকরা যে যার কাজে লেগে গেল।

আমি ডেকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম রত্নদ্বীপের পানে। ওই সেই রত্নদ্বীপ। ওখানেই পোঁতা আছে সাত রাজার রত্নভাণ্ডার। ওই রত্নভাণ্ডারের জন্যে এ যাবৎ কত মানুষের জীবন গেছে। আরও যাবে কত জীবন।

শেষ পর্যন্ত আমাদেরও কি ভোগে লাগবে ওই ধনসম্পদ?

দূর থেকে রত্নদীপকে মনে হয় রহস্যময় প্রেতপুরী।

ওখানে গেলে বোধহয় বাতাসের অভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে। কেমন একটা পচা গন্ধ বাতাসের ঝাপটায় নাকে লাগছে। এ গন্ধ কি ওখানকার মরা মানুষদের গন্ধ? ওই রত্নদ্বীপের প্রেতপুরীতে কারা থাকে? যে সব মানুষকে ওখানে মেরে ফেলা হয়েছে, তারাই কি প্রেত হয়ে ওখানে পাহারা দিচ্ছে?

পিঠে কার স্পর্শ পেলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি ডাক্তার লিভোসী।

—ওদিক পানে তাকিয়ে কি দেখছো জিম?

—রত্নদ্বীপের চেহারা দেখছি।

—কি মনে হচ্ছে?

—মনে হচ্ছে একটা প্রেতপুরী।

—ঠিক তাই। ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট অসংখ্য মানুষকে খুন করে ওখানে লুকিয়ে রেখেছে রত্নভাণ্ডার। ওখানে গেলে সেই হতভাগা লোকদের অভিশপ্ত আত্মার স্পর্শ হয়তো পেতে হবে আমাদের।

—একটা মজার ব্যাপার দেখুন, আমি বললাম, ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট অনেক কষ্ট করে রত্নভাণ্ডার জমালেন, কিন্তু তিনি নিজে ভোগ করে যেতে পারলেন না।

—এই তো এমনিই হয়। কথায় বলে না পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। পাপের টাকা কখনো ভোগে লাগে না।

এই সময় ক্যাপ্টেন স্মলেট এসে হাজির হলেন।

—নাঃ। আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

—কেন ? আপনার আবার কি হল ? ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

—কি হয়নি তাই বলুন। এই রত্নদ্বীপের দেখা পাবার পর থেকে নাবিকদের মেজাজই যেন বদলে গেছে। সবাই যেন এক একটা ক্ষুদে নবাব হয়ে বসেছে।

—তার মানে ?

—তার মানে হল, ওরা আর আমার মতো সামান্য এক জাহাজের ক্যাপ্টেনকে মানুষ বলেই মান্য করতে চাইছে না। ক্যাপ্টেন হিসাবে আমি যাকে যা নির্দেশ দিচ্ছি, সেই তা পালন করতে গড়িমসি করছে।

—মুস্কিল হলো তো। ডাক্তার বললেন, ওরা দস্যুরা যাই হোক না কেন, ওদের মধ্যে তো কাজেকর্মে গাফিলতি দেখা যায় নি কখনো।

—সে তো আমিও হাজারবার বলেছি। ওরা ডাকাত হলেও নাবিক হিসাবেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এই রত্নদ্বীপের ছোঁয়া লাগামাত্র ওদের স্বভাবে পরিবর্তন এসেছে।

—সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। আগে ওদের মধ্যে কখনো ঝগড়াঝাটি বা মারামারি দেখিনি। কারো মুখে অশ্লীল গালাগালিও শুনিনি। কিন্তু এখন সব সময় ওদের মুখে খারাপ গালাগাল শুনছি। ছোটখাটো মারপিটও নাকি হয়ে গেছে।

—চুলোয় যাক। মারামারি করে মরুক ওরা। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, কিন্তু জাহাজে এখন কত কাজ। নাবিকরা কাজ না করলে কাজগুলো করবে কারা শুনি।

ডাক্তার লিভোসী বললেন, আমার মনে হয় লং জনের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলা ভালো। সেই তো ওদের সর্দার।

ক্যাপ্টেন বললেন, আমি ওসব সর্দার টর্দারের সঙ্গে কথা বলতে পারবো না।

—আচ্ছা ঠিক আছে। যা বলবার আমিই বলবো। ডাক্তার লিভোসী হেসে বললেন, আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না।

—বাঁচা গেল। যত সব পাগলের কাণ্ড। ক্যাপ্টেন গজগজ করতে করতে চলে গেলেন।

ডাক্তার লিভোসী আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে চলে গেলেন। আমিও আমার কেবিনের দিকে চলে গেলাম।

॥ রত্নদ্বীপের মাটিতে পা রাখলাম ॥

ডাক্তার লং জনকে কি বলেছিলেন জানি না, তবে তাতে বিশেষ কোন কাজ হল না। লং জন নাবিকদের মধ্যে খুব ঘোরাফেরা করতে লাগল, তাদের সঙ্গে কি সব কথাবার্তা বলল। কিন্তু নাবিকদের মেজাজ নরম হল না।

আমি অবশ্য এর মধ্যে বুঝে নিয়েছিলাম যে নাবিকদের মধ্যে সকলেই লং জনের লোক নয়। ওদের মধ্যে টম আর এ্যালান নামে দুই যুবককে আমার খুব ভালো লাগে। ওরা দুইজন একসঙ্গে থাকে, লং জনের সঙ্গে বিশেষ মিশতে দেখি না। নাবিক হিসাবে নিজের কর্তব্য করে যায়।

ক্যাপ্টেন স্মলেটও ওদের খুব প্রশংসা করেন।

লং জন সম্ভবত ওদের দলের লোকদের বোঝাতে লাগল যে কাজে গাফিলতি করে কোন লাভ নেই। এখন মাথা গরম করলে কোন কাজই হবে না। বরঞ্চ ক্যাপ্টেনের কথা শুনে চললে আখেরে লাভই হবে।

লং জন ওদের বোঝানোর পরও ওরা বুঝল বলে মনে হল না। আর ওরাও বোধহয় লং জনকে কিছু একটা বুঝিয়ে থাকবে। কেননা

লং জনকেও খুব অস্থির দেখা যেতে লাগল। কখনো ছুটোছুটি করছে অস্থিরভাবে—কখনো মাতালের মতো গান গাইছে।

আমার মনে হল, ওর দল আর অপেক্ষা করতে রাজী নয়। সেই রকমই ওকে বুঝিয়েছে।

যাহোক, পরিস্থিতি গুরুতর দেখে ক্যাপ্টেনের কেবিনে আমরা সবাই পরামর্শ করতে বসলাম।

ডাক্তার লিভোসী বললেন, নাবিকরা তো সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। ক্ষেপে গেলে মুস্কিল।

ট্রিলনী বললেন, হঠাৎ ক্ষেপে যাবার কারণটা কি ?

ক্যাপ্টেন বললেন, হঠাৎ নয়, ওরা অনেকদিন ধরেই ক্ষেপে আছে। এখন রত্নদ্বীপে এসে ওদের মেজাজ একেবারে চড়ে গেছে। ওরা ভাবছে, রত্নভাণ্ডারের নাগাল তো পেয়েই গেছি। আর কাকে তোয়াক্কা করবো।

ট্রিলনী বললেন, এখন কি করা যায় বলুন ?

ক্যাপ্টেন বললেন, নাবিকরা হাত পা গুটিয়ে বসে আছে। জাহাজ তো অচল।

ট্রিলনী বললেন, ক্যাপ্টেন হিসাবে আপনি আদেশ দিয়ে দেখুন না কেন ?

—পাগল হয়েছেন। আমি এখন কোন আদেশ দিতে গেলে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে। ওরা সোজাসুজি বিদ্রোহ করবে।

তাইতো, ব্যাপারটা খুব জটিল। ডাক্তার বললেন, আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না।

ক্যাপ্টেন বললেন, একটা কাজ করলে হয় অবশ্য। একনাগাড়ে অনেকদিন জাহাজে থাকতে থাকতে ওদের মন মেজাজ আরও বেশী খারাপ হয়ে গেছে। ওরা যদি ঘণ্টা ছুয়েকের জন্যে দ্বীপে নেমে একটু ঘোরাঘুরি করে আসতো, তবে খানিকটা স্বাভাবিক হতো মনে হয়।

—রত্নদ্বীপে যদি কোনক্রমে রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে যায় ?

ট্রিলনী বললেন।

—সেটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। ম্যাপের নিশানা ছাড়া অনন্তকাল ধরে খুঁজলেও ওরা রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পাবে না।

—তাহলে ওদের ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে ছুটি দেওয়া যাক। কি বলেন ?

—ঠিক আছে। ছুটি দিয়ে দিন। ডাঙ্গায় ঘোরাফেরা করে একটু চাঙ্গা হয়ে নিক।

ক্যাপ্টেন লং জনকে ডেকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। লং জন নাবিকদের কাছে গিয়ে কি পরামর্শ করল। তারপর ফিরে এল ওদের সঙ্গে করে।

ডেকের উপর সকলেই জড়ো হয়েছে।

ক্যাপ্টেন ওদের বললেন, প্রিয় নাবিকগণ, তোমরা অনেকদিন জাহাজের উপর রয়েছ। এই অবস্থায় একঘেয়েমি আসা স্বাভাবিক। তোমাদের ঘণ্টা দুয়েকের ছুটি মঞ্জুর করা হল। তোমরা ইচ্ছে করলে দ্বীপে নেমে একটু ঘুরে আসতে পারো। জাহাজের নৌকা করেই তোমরা যাবে। তবে হ্যাঁ, ঠিক সময়ে ফিরে আসবে। আমি নির্দিষ্ট সময়ে বন্দুক ফায়ার করলেই তোমরা নৌকা করে ফিরে এসো।

ক্যাপ্টেনের ঘোষণা শুনে নাবিকদের মধ্যে উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। সকলেই যেন তক্ষুণি যাবার জন্যে ব্যস্ত।

লং জন তাদের লাঠি দিয়ে মৃদু আঘাত করে শান্ত করতে লাগল।

নাবিকরা হৈ চৈ করতে করতে চলে গেলে। ওদের হৈ চৈ করা দেখে ক্যাপ্টেন আমাকে আর রেডরুথ, জয়েস ও হান্টারকে ওদের সম্বন্ধে সাবধানে থাকতে বললেন। আমাদের চারজনকে তিনি চারটি গুলিভরা পিস্তল দিলেন প্রয়োজনে ব্যবহার করবার জন্যে।

পিস্তলটা আমি প্যাণ্টের পকেটে সাবধানে রেখে দিলাম। তারপর জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে নাবিকদের যাত্রার তোড়জোড় দেখতে লাগলাম।

জাহাজে নাবিক সবসুদ্ধ উনিশ জন।

সেই উনিশ জনই নৌকায় করে রত্নদ্বীপে যেতে চায়। তাই নিয়ে হট্টগোল।

লং জন তেরজন নাবিককে সঙ্গে নিল। ছয়জন নাবিককে রেখে গেল জাহাজে। মনে হয়, জাহাজ পাহারা দেবার জন্যেই রেখে গেল। আমাদের ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না।

তেরজন নাবিক দুখানা নৌকায় উঠল। বিশাল নৌকা, পেছনের দিকে বিশাল পালের কাপড় জড়ো করে রাখা। জাহাজের নীচ দিয়ে যখন যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ কি ভেবে আমি টুপ করে লাফিয়ে পড়লাম নৌকার উপর। সেই জড়ো করে রাখা পালের কাপড়ে বসে রইলাম। একেবারে পিছন দিকে ছিলাম বলে আমাকে কেউ লক্ষ্য করল না।

নাবিকরা মদ খাচ্ছে, গান গাইছে, হৈ হল্লা করছে। রত্নদ্বীপের রত্ন পাওয়ার আনন্দে যেন উন্মাদ হয়ে পড়েছে। ওদের ধারণা রত্নদ্বীপে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা পেয়ে যাবে এত এত ধনরত্ন।

কিন্তু দ্বীপে নামার সময় তো ওরা আমাকে দেখতে পাবে? তখন কি হবে? বিনা বাক্য ব্যয়ে আমার গলা টিপে সাগর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

রত্নদ্বীপে আমিই হবো সম্ভবত ওদের প্রথম শিকার। আমার এখন পালানো দরকার। কিন্তু কি ভাবে পালাবো? সাগর জলে লাফিয়ে পড়লে হাঙ্গর খেয়ে ফেলবে মুহূর্তের মধ্যে।

তবে কি শেষ পর্যন্ত ওদের হাতেই মরতে হবে?

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। পালাবার কোন উপায়ই খুজে পেলাম না। এদিকে দ্বীপ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। দ্বীপের গাছপালা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ওরা নৌকাটাকে কূলের কাছ দিয়ে চালাতে লাগল।

একটা বিশাল গাছ অসংখ্য ডাল পালা নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে জলের উপর।

মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নিলাম। আমাদের নৌকাটা ডালপালার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আমি গাছের একটা ডাল ধরে তরতর করে উপরে উঠে গেলাম। নৌকা চলে গেল।

আমি গাছের ডাল বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে রত্নদ্বীপের মাটিতে পা রাখলাম।

॥ ও কে? বনমানুষ না গ্যেরিলা ॥

রত্নদ্বীপের মাটিতে পা দিয়ে আমার মনের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত শিহরণ জাগল।

এই সেই রত্নদ্বীপ। এখানকার মাটির মধ্যে কোথায় লুকানো আছে সেই রাজার ঐশ্বর্য।

চারধারে তাকিয়ে আমার মনটা বেশ দমে গেল। গাছপালা ভরা ঘন জঙ্গল। এর মধ্যে কোথায় সেই গুপ্তধন? সত্যি সত্যি তা কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

একটু পরেই হৈ-হল্লা শুনে দেখলাম, নৌকা দুটো উপকূল ভাগে একটা পাথরের সঙ্গে লাগানো হয়েছে। নাবিকের দল লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। ওই তো লং জন, ওই টম, ওই সেই ব্ল্যাক ডগ, ওই যে ইজরায়েল।

ওরা দেখি দুটো দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

লং জন দেখি আমার দিকেই আসছে। ও কি আমাকে দেখতে পেয়েছে?

আমি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম।

পাশে একটা বড়ো জলা। কত রকমের যে পাখি। ওরা আমার মতো একটা মানুষ দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। জলার ধার দিয়ে পাহাড় উঠে গেছে।

পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সাপ। একটা সাপ আবার বিচিত্র শব্দ করে উঠল। আমি বুঝতে পারলাম, এই সেই বিখ্যাত র‍্যাটল সাপ।

জঙ্গলের মধ্যে অসংখ্য নাম না জানা লম্বা লম্বা গাছ। পাইন গাছটাকে শুধু চিনতে পারলাম।

অনেকখানি ছুটে এসে এক জায়গায় বসে একটু বিশ্রাম করতে লাগলাম।

হঠাৎ শুনি বক আর ডাহুকের দল চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। কয়েকটা পাখি আকাশে উড়ে গেল।

যেন কি দেখে ভয় পেয়েছে ওরা।

ঝোপের আড়াল থেকে সন্তর্পণে দেখলাম, লং জন আর টম কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। আমি কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম ওদের কথা। লং জন বেশ মিষ্টি গলায় টমকে বলছে, দ্যাখ টম, ভালো করে ভেবে দ্যাখ, আমাদের সঙ্গে কাজ করলে তোমার অনেক লাভই হবে। এখানে যা ধনরত্ন আছে, তা আমরা সবাই ভাগ করে নেবো।

টম বলল, না আমি ওভাবে ধনরত্ন পেতে চাই না। পরিশ্রম করে যে টাকা আমি উপায় করতে পারবো, তাই আমার কাছে যথেষ্ট।

লং জন বলল, তুমি একটা মূর্খ। এত করে বোঝাচ্ছি তবুও বুঝতে পারছো না। তোমাকে তো অনেকবার বলেছি, এখানে ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের গুপ্তধন পোঁতা আছে। ওতে আমাদের ন্যায্য অধিকার।

টম বলল, তোমাদের অধিকার থাকতে পারে কিন্তু আমার নেই। মালিক আমাকে জাহাজে চাকরি দিয়েছেন, তার নুন খেয়ে আমি নেমকহারামী করতে পারবো না।

লং জন রেগে গিয়ে বলল, টম আমি শেষবারের মতো বলছি। তুমি আমাদের দলে চলে এসো। একা একা কখনো বাঁচতে পারবে না।

টমও রেগে গিয়ে বলল, আমি তোমাকে হাজারবার বলেছি, আমি তোমাদের এসব ব্যাপারে থাকতে চাই না। তবু বার বার এসব বলছো কেন?

লং জন এবার একটু নরম গলায় বলল, তোমার ভালো চাই বলেই এসব বলছি। তোমার উপর আমার কেন জানি মায়া পড়ে গেছে। কি হবে সারা জীবন এইসব ছুটকো চাকরী করে। এর চেয়ে একবারে বড়লোক হওয়া ভালো নয় কি ?

টম বলল, তুমি এসব ছেড়ে দাও জন। জীবনে তো অনেক অন্যায় করেছো, এখন আর অন্যায় করো না।

—টম তোমাকে শেষবারের মতো বলছি আমাদের দলে যোগ দাও। ক্রোধে লং জনের চোখ জ্বলে উঠল, না হলে তোমার আজ শেষ দিন।

টম কোন উত্তর না দিয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগল।

আর ঠিক সেই সময় দূর থেকে ভেসে এল আর্ত চীৎকার, বাঁচাও বাঁচাও—মেরে ফেলল। সেই আর্ত চীৎকার ধ্বনিত হতে লাগল পাহাড়ের গায়ে। এক ঝাঁক পাখি ভয় পেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে আকাশে উড়ে গেল। টম থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ভয়ার্ত চোখে তাকাল লং জনের দিকে। কাঁপা গলায় বলল, ও কার গলা ?

লং জন স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, তোমার বন্ধু এ্যালানের।

—কি হয়েছে এ্যালানের ?

—কি হয়েছে তা এখনও বুঝতে পারনি ? এ্যালানকে খুন করা হয়েছে।

—খুন ? এ্যালানকে তোমরা খুন করলে ? এ্যালান—এ্যালান—একটা নিরীহ নির্দোষ ছেলে—তাকে তোমরা এই নির্জন দ্বীপে খুন করলে। তোমরা—

টমের কথা শেষ হল না। লং জনের মোটা লাঠিটা সবলে এসে পড়ল টমের মাথায়।

টম যন্ত্রণায় চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

লং জন আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতিতে তার উপর ওই এক পা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে পকেট থেকে একটা ছোরা বের করে টমের বুকে আমূল বসিয়ে দিল।

টমের শরীরটা কয়েকবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

এইমাত্র আমার চোখের সামনে অতি সহজভাবে যে খুনটা হয়ে গেল, তা যেন তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না।

ওই তো লং জন ছোরাটা টেনে নিয়ে রক্ত মুছছে। যেন কিছুই হয়নি। সত্যি কত সহজভাবে এরা মানুষ খুন করতে পারে। আমাকে যদি দেখতে পায়, তবে আমাকেও তো এক্ষুণি মেরে ফেলবে। হয়তো আমাকে দেখেছে। দেখেও না দেখার ভান করে আছে। এখানে সুযোগ বুঝে আমাকে ধরবে।

এদিকে দ্বীপের উপর ছায়া নামছে! সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ছে। এক্ষুণি হয়তো ক্যাপ্টেন স্মলেটের বন্দুকের শব্দ শোনা যাবে। ওরা সবাই নৌকায় উঠবে। কিন্তু আমি ফিরবো কি করে।

আসবার সময় হৈ চৈ-এর মধ্যে আমাকে লক্ষ্য করেনি। কিন্তু যাবার বেলায় তো তা হবে না। তবে কি আমি এই নির্জন প্রেত-পুরীতে একলা পড়ে থাকবো? রাত্রে হিংস্র পশুর দল আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

লং জন এই সময় পকেট থেকে একটা বাঁশী বের করে তিনবার ফুঁ দিল।

মনে হল এটা কোন সংকেত। তিনবার বাঁশীর শব্দ করে দলের লোকদের ডাকল। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি তাড়াতাড়ি পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়ালাম। দরকার হলে দৌড়ে পাহাড়ের উপর উঠে যাবো।

লং জন বেশ খানিকটা পিছনে পড়ে গেছে।

আমি গাছপালা সরিয়ে আর একটু ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা বড়ো পাথর গড়াতে গড়াতে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল।

আমি এক লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আর

একটা পাথর তীর বেগে গড়াতে গড়াতে নীচে নেমে এল। আমি এবারও লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ালাম।

আমাকে কি কেউ পাথর চাপা দিয়ে মারতে চাইছে? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? পাথর দিয়ে মারতে চাইলে তো এতক্ষণ আমার উপর পাথর বৃষ্টি শুরু হয়ে যেত।

ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো।

আমি আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলাম।

আর ঠিক সেই সময় সামনের গাছগুলোর ঘন ডালপালার আড়াল থেকে একটা মুখ উঁকি দিল। আমি চমকে উঠলাম। কে ও? বনমানুষ না গ্যেরিলা?

মাথায় লম্বা লম্বা চুল ঘাড় বেয়ে নেমে পড়েছে। সমস্ত মুখ দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা।

মুখের রঙ তামাটে। আর সেই তামাটে মুখে পিঙ্গল একজোড়া চোখ জ্বল জ্বল করছে।

কে ও বনমানুষ না গ্যেরিলা?

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

আমি চোখ সরাতে পারছি না। ওর চোখে যেন সম্মোহন আছে।

পাহাড়ের গায়ে অন্ধকার ছায়া নেমে আসছে। সমুদ্রের জলে সূর্যের প্রতিফলন!

তবে কি আজকেই আমার শেষ সূর্যদর্শন?

॥ রত্নদ্বীপের রহস্যময় মানুষ ॥

আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। সামনেও এগোতে পারছি না, পিছনেও সরতে পারছি না। পিছনে সরলে লং জনের খপ্পরে পড়তে হবে, আর সামনে এগোলে এই অদ্ভুত জীবটার কবলে।

হঠাৎ আমার পিস্তলটার কথা মনে পড়ল। ক্যাপ্টেন স্মলেট আমায় পিস্তলটা দিয়েছিলেন। এতক্ষণ এটার কথা মনেই ছিল না।

পিস্তল থাকতে ভয় কি। পিস্তলটার স্পর্শে আমার শরীরে যেন দ্বিগুণ সাহস জেগে উঠল।

আমি পিস্তলটা বের করে সেই অদ্ভুত জীবটার দিকে তাক করতেই সে হাত তুলে সামনে বেরিয়ে এল। তখন ভালো করে তার দিকে লক্ষ্য করলাম।

নাঃ। বনমানুষ বা গ্যেরিলা নয়। এ আমাদের মতো মানুষই। পরণে শতচ্ছিন্ন একটা ময়লা প্যান্ট।

ছেঁড়া প্যান্ট আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু এরকম অদ্ভূত ছেঁড়া প্যান্ট আমি এর আগে কখনো দেখিনি। প্যাণ্টের সুতোগুলো সব আলগা হয়ে ঝালরের মতো ঝুলছে। এর উপর জাহাজের পালের টুকরো, ছাগল চামড়ার টুকরো আরও কত কিছুর টুকরো দিয়ে তালি দেওয়া হয়েছে। সেইসব অসংখ্য বিচিত্র তালি প্যাণ্টের উপর নানাদেশের পতাকার মতো শোভা পাচ্ছে। এই প্যাণ্টটা আটকানো রয়েছে একটা পিতলের আংটাওয়ালা বেল্ট দিয়ে।

লোকটি দুহাত তুলে এগিয়ে এসে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

ভালো করে দেখে বুঝতে পারলাম, এই হতভাগ্য মানুষটা আমাদের মতো একজন সাদা চামড়াওয়ালা মানুষ।

আমি পিস্তলটা হাতে রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, কে তুমি? লোকটা প্রথমটা হাউমাউ করে কি বলল বুঝতে পারলাম না।

আমি বললাম, তোমার পরিচয় কি? থেমে থেমে বল। লোকটা এইবার থেমে থেমে কথা বলতে লাগল। খুব জড়ানো কথা। তবু এবার বুঝতে আমার অসুবিধা হল না।

লোকটি বলল, তিন বছর পর এই প্রথম মানুষের ভাষায় কথা বললাম। এই প্রথম মানুষকে দেখলাম।

আমি এবার বললাম, তোমার নাম কি?

—বেন গান।

—তুমি কতদিন এই দ্বীপে বাস করছো ?

—তিন বছর। তিন বছর আমি এই দ্বীপে একা একা বাস করছি।

—তুমি এখানে এলে কি করে ?

—তিন বছর আগে আমার সাথী নাবিকরা আমায় এখানে ফেলে চলে গিয়েছিল।

—তোমার সাথী নাবিকরা কারা ?

—লং জন—বিল বোনস—

—লং জন ? তুমি লং জন-এর জাহাজে ছিলে ? আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

—হ্যাঁ ছিলাম। কেন ? তুমি কি লং জন-এর লোক ? হায় ঈশ্বর। লোকটা যেন হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়ল, তাহলে আর আমার রক্ষা নেই।

আমি বুঝতে পারলাম, বেন গান লং জনের শত্রু পক্ষের। তাই আমি বললাম, না না তোমার কোন ভয় নেই। আমি লং জনের লোক নই।

—তুমি লং জনের লোক নও। বাঁচা গেল। লোকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, উঃ। যা ভয় পেয়েছিলাম। ভাই, তুমি আমাকে একটু পনির খাওয়াতে পারো ? উঃ। কত বছর পনির খাইনি।

—পনির ? আমি অবাক হয়ে বললাম, এত জিনিস থাকতে পনির !

—হ্যাঁ পনির। পনির খেতে আমি খুব ভালোবাসি। খাওয়াবে একটু পনির ?

—নিশ্চয়ই খাওয়াবো। জাহাজে ফিরে যেতে পারলে তুমি যত খেতে চাও তত পনির খাওয়াবো। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এই তিন বছর কি খেয়েছো ?

—এই তিন বছর শুধু ছাগল মেরে মেরে খেয়েছি। ছাগল না মিললে সমুদ্রের ঝিনুক খেয়েছি। তোমার নামটি কি ভাই ?

—জিম।

—বেশ বেশ। তা শোন জিম, তিন বছর পর তোমাকে দেখে আমার ভারী ভালো লাগছে। তুমি যেন স্বর্গের দেবদূত। তোমাকে আমি প্রচুর ধনরত্ন দেব, বুঝলে প্রচুর ধনরত্ন?

—কোথায় পাবে তুমি প্রচুর ধনরত্ন?

—আছে। বেন গান ফিস ফিস করে বলল, আমি ছাড়া কেউ জানে না। আমি তোমাকে রাজা করে দেব।

—রাজা হবার সাধ আমার নেই। আমি বললাম, তোমার কথা শুনতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কি করে তুমি এই দ্বীপে এলে বলো তো।

—শুনবে? তাহলে সংক্ষেপে বলি শোন। আমি ছিলাম ওই দস্যুনেতা ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের জাহাজের নাবিক। ফ্লিণ্টের সহকারী ছিল লং জন, বিল বোনস, ব্ল্যাক ডগ, আরও অনেকে। 'ওয়ালরায়' জাহাজে চড়ে ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট লুটপাট করতো। একদিন ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট ছয়জন নাবিককে নিয়ে বিশাল এক বোটে হীরে জহরৎ সোনা বোঝাই করে এই দ্বীপে এল। কদিন পর ফিরে গেল। আমরা সবাই বুঝতে পারলাম, ক্যাপ্টেন সেই ছয়জন নাবিককে মেরে ফেলেছে। একটা লোক ছয়জন জোয়ান নাবিককে মেরে ফেলতে পারে তাতেই বুঝে নিতে হবে সে কতখানি ভয়ঙ্কর লোক।

—তারপর?

—এরপর থেকে আমার মনে খুব ভয় ধরে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, আজ হোক কাল হোক, আমার কপালে ওই একই পরিণতি লেখা আছে। সুযোগ পেয়ে আমি একদিন পালিয়ে আর একটি বাণিজ্য জাহাজে চাকরী নিলাম। একদিন দেখলাম, আমাদের জাহাজ রত্নদ্বীপের কাছে নোঙর করেছে। আমি কজন সঙ্গী নাবিককে বললাম, এখানে প্রচুর ধনরত্ন আছে। চল আমরা একটা বোট নামিয়ে সেগুলো নিয়ে আসি। তারা আমার কথায়

রাজী হল। একটা বোটে করে এখানে এসে অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম। ধনরত্ন কিছুই মিলল না। আমার সঙ্গীরা রেগে-মেগে আমাকে এখানে ফেলে রেখে চলে গেল। আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করলাম। ওরা এমন নিষ্ঠুর যে আমার অনুনয়ে ভ্রূক্ষেপও করল না। আমি বোটে উঠতে গেলে ধাক্কা মেরে আমাকে জলে ফেলে দিল। সেই থেকে আমি এখানে একা পড়ে আছি।

বেন গানের কথা শুনে আমার খুব দুঃখ হল।

আমি বললাম, আমাদের জাহাজে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবো। কিন্তু এখন জাহাজে ফেরাই তো সমস্যা।

—কেন, সমস্যা কেন ?

আমি তখন সংক্ষেপে সব কথা ওকে বলে বললাম। লং জন দলবল নিয়ে এতক্ষণ হয়তো ফিরে গেছে। আমি ফিরবো কি করে ?

—আমি তোমাকে একটি নৌকা দেব। আমি কাঠ কেটে এমন একখানা ক্ষুদে নৌকা তৈরী করেছি যা সমুদ্রের জলে ডোবে না। তুমি সেই নৌকা নিয়ে জাহাজে চলে যাও।

—কোথায় সেই নৌকা ?

—লুকানো আছে। আমি এনে দিচ্ছি। তুমি—

বেন গানের কথা শেষ হল না, আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে শব্দ শোনা গেল—

গুম গুম গুম।

কামান দাগার শব্দ।

জাহাজের কামান থেকে গোলা বর্ষণ করা হচ্ছে।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

॥ রত্নদ্বীপে প্রথম লড়াই ॥

আমার চোখের সামনে জঙ্গল।

ভালো করে দেখবার জন্যে আমি সমুদ্রের ধারে দৌড়ে গেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে লং জনের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সমুদ্রের

ধারে গিয়ে দেখতে পেলাম দূরে আমাদের জাহাজ দেখা যাচ্ছে। একটা বোট জলের মধ্যে উলটে রয়েছে। কয়েকজন মানুষ জলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে।

একজনের হাত উপর দিকে তোলা—সেই হাতে একটি বন্দুক। হাতখানা দেখে চিনতে আমার অসুবিধা হল না। এই হাতখানা ক্যাপ্টেন স্মলেটের। জামার হাতার উপর ক্যাপ্টেনের যে বিশেষ তারকা চিহ্নগুলো থাকে, তাই দেখে আমি ক্যাপ্টেনকে সনাক্ত করতে পারলাম।

ক্যাপ্টেন যখন আছে, তখন আমাদের দলের সকলেই আছে। কিন্তু ওরা জলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে কেন? জাহাজের ছয় জন নাবিক কি বিদ্রোহ করেছে? তাই ওরা পালিয়ে আসছিলেন?

কিংবা ওরা কি বোটে করে দ্বীপে আসছিলেন গুপ্তধনের সন্ধানে?

আমি ওদের দিকে চোখ রেখে দৌড়তে লাগলাম। দেখতে পেলাম, ওরা জল থেকে উঠে ছুটছেন। ওই তো ট্রিলনী। ওই ডাক্তার। ওই রেডরুথ। ওই ক্যাপ্টেন। ওরা প্রাণপণে ছুটছেন।

আরে। ওটা আবার কি? একটা দুর্গের মতো। চারধারে বড়ো বড়ো মোটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী করা একটা দুর্গ। হয়তো জলদস্যুরা অনেক আগে তৈরী করেছিল। ওই দিকেই তো ছুটছে সবাই।

হঠাৎ শুনি অনেকগুলো গলার বিকট চীৎকার।

তাকিয়ে দেখি একটা বড়ো দল পাশ থেকে আমাদের দলের দিকে ছুটে আসছে। সর্বনাশ। এ যে দেখি লং জনের দল। ওই তো লং জন লাঠিতে ভর দিয়ে ছুটে আসছে ওদের পিছন পিছন।

আমাদের দল প্রাণপণে দুর্গ লক্ষ্য করে ছুটছে। দস্যুদলও পিছন পিছন তাড়া করছে। ওই ধরে ফেলল বলে।

হঠাৎ দেখি, ক্যাপ্টেন বন্দুকটা ট্রিলনীর হাতে দিয়ে দিলেন। আর মুহূর্তের মধ্যে আকাশ ফাটিয়ে ট্রিলনীর বন্দুকটা গর্জে উঠল—গুড়ুম।

ওই তো। দস্যুদলের কে একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু ওরা তো থামছে না।

ক্যাপ্টেন বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছেন। রেডরুথ সবার আগে। আর একটু হলেই দুর্গে ঢুকবে।

হঠাৎ আবার পিস্তলের গুলির শব্দ।

কিন্তু একি। রেডরুথ লুটিয়ে পড়েছে মাটির উপর। দস্যুদের কেউ বোধহয় প্রাণপণ ছুটে দুর্গের একেবারে কাছে এসে পড়েছিল। সেই গুলি করেছে রেডরুথকে।

আর ঠিক এই সময়ে দুর্গ থেকে হৈ হল্লা করে বেরিয়ে পড়ল একদল লোক। এ তো সবার হাতেই বন্দুক। আরে। এ তো দেখছি সকলেই আমাদের দলের লোক। ওরা দুর্গের মধ্যে এল কখন ?

আমাদের দলের মানুষরা বন্দুকের আওয়াজ করতেই দস্যুর দল এদিক ওদিক পালিয়ে গেল।

আর সেই সময় আমি হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম।

তখন সবাই রেডরুথকে নিয়ে ব্যস্ত।

রেডরুথের দেহ অসাড় নিস্পন্দ। শরীর রক্তাক্ত।

ট্রিলনী তার শিয়রের কাছে বসে কাঁদছেন। রেডরুথ ছিল তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহচর। তাঁর বহুকালের সাথী। সেই সাথীর এই নির্জন দ্বীপে প্রাণ গেল। এ ব্যথা তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, রেডরুথ, আমার প্রিয় সাথী। আমার জন্যেই অকালে মরতে হল তোমায়। আমায় ক্ষমা কর রেডরুথ।

চারপাশে সকলে দাঁড়ালো। সকলের চোখে জল। ট্রিলনী সমানে বলে চলেছেন, রেডরুথ যাবার সময় ক্ষমা করে যাও আমাকে। বল, ক্ষমা করলে ?

কে দেবে উত্তর ? রেডরুথ তখন সব কিছুর উর্ধ্বে।

রেডরুথকে কাছেই একটা জায়গায় কবর দেওয়া হল।

সবার মন খারাপ।

এর মধ্যেই ওরা আমাকে এক চোট বকুনি লাগালেন আমার হঠকারিতার জন্যে। আমি ওদের না জানিয়ে দুঃসাহসে ভর করে চলে গিয়েছিলাম লং জনের নৌকায়। যে কোন মুহূর্তে আমার প্রাণ যেতে পারতো।

ওরা আমায় বকুনি দিলেন, আবার বাহবাও দিলেন আমার সব কথা শুনে। বেন গানের কথা শুনে ওরা খুব খুশী। আমার মতো ওদেরও ধারণা হল, বেন গান এতদিন এই দ্বীপে আছে। ও নিশ্চয় গুপ্তধনের খবর পেয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা করে সব খবর জেনে নিতে হবে।

এরপর আমি ওদের কাছ থেকে জাহাজের ঘটনাগুলো জেনে নিলাম। ডাক্তারবাবু ধীরে সুস্থে ভালোভাবে গুছিয়ে বলতে পারেন। তিনি বললেন, লং জন দলবল নিয়ে দুটো বোটে করে চলে যাবার পর শোনা গেল তুমিও ওদের সঙ্গে চলে গেছ। আমরা তো খুব চিন্তায় পড়লাম। তোমাকে দেখতে পেলেই ওরা মেরে ফেলবে। আমি তখন ট্রিলনীর সঙ্গে পরামর্শ করে হাণ্টারকে নিয়ে জলী বোটে চেপে রত্নদ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল—তোমার খোঁজ করা আর রত্নদ্বীপে ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের কাঠের দুর্গটার খোঁজ করা। ম্যাপে কাঠের দুর্গের চিহ্ন আছে।

দ্বীপে পৌঁছে ম্যাপ দেখে আমরা কাঠের দুর্গটা খুঁজে বের করলাম। চারধারে মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বিশাল একটা ঘর তৈরী করা হয়েছে। জনা কুড়ি লোক এর মধ্যে বাস করতে পারে। এই দুর্গের চারধারে আবার মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বেড়া দেওয়া। খুব উঁচু বেড়া। আর সবচেয়ে যেটা ভালো ব্যাপার—সেটা হল—ভিতরে একটা মিষ্টি জলের ফোয়ারা।

ডাক্তার বলে চললেন, এই ফোয়ারা দেখেই কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। ভাবলাম জাহাজ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ও লোকজন এনে এখানে

আমরা আশ্রয় নেব আর এখান থেকে গুপ্তধন খুঁজবো। লোকজন সব এলে তোমাকেও খুঁজে বের করা সহজ হবে। এই মনে করে আমরা জাহাজে ফিরে গেলাম। এদিকে লং জন জাহাজে যে ছয় জন নাবিককে পাহারায় রেখে গিয়েছিল তারা তো বুঝে গিয়েছে, আমরা চলে যাচ্ছি। ওরা একটা কিছু করার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে ওদের মধ্যে আছে ইজরায়েল—যেমন গুণ্ডা তেমনি গোঁয়ার। ওদের আগে বন্দী করা দরকার। তাই আমরা ওদের সামনে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, এক পা নড়বে না। নড়লে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলবো।

ট্রিলনী আর ক্যাপ্টেন ওদের পাহারায় রইলেন। আমি জয়েস আর হাণ্টারকে নিয়ে জলী বোট বোঝাই করে খাদ্যদ্রব্য বস্ত্র ওষুধপত্র অস্ত্রশস্ত্র আর নানারকম যন্ত্রপাতি নিয়ে দ্বীপে রেখে এলাম। বারকয়েক যাতায়াত করতে হল আমাদের। মালপত্তর সব কূলে রেখে আমরা শেষবারের মতো জাহাজে এলাম। এবার সবাই বোটে উঠল।

ক্যাপ্টেন স্মলেট ওই ছয়জন নাবিককে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা সবাই শোন। আমরা এ জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে আসতে চাও, আসতে পারো।

নাবিকদের কেউ কোন উত্তর দিল না।

ক্যাপ্টেন তখন ওদের মধ্যে আব্রাহাম গ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, আব্রাহাম, তোমাকে সৎ বলে জানি। তুমি আমাদের সঙ্গে আসছো না কেন ?

ওদিক থেকে আব্রাহাম যেমনি বলেছে, আসছি, সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চীৎকার। আব্রাহাম ছুটতে ছুটতে চলে এল আমাদের কাছে। ওর হাত থেকে রক্ত ঝরছে। ওর দলের লোক ওকে ছোরা মেরেছে।

আব্রাহামকে নিয়ে আমরা বোট ভাসিয়ে দিলাম। কিছুদূর আসার পর ক্যাপ্টেন জাহাজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ওরা কামানের মুখটা আমাদের বোটের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

ক্যাপ্টেন আঁতকে উঠে বললেন, সর্বনাশ। কামানটা তো অকেজো করে আসা হয়নি। ওরা যে কামান দাগছে। ট্রিলনী বন্দুক হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

কামানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইজরাইল। ওই কামান দাগার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

ট্রিলনী তার দিকে তাক করে বন্দুকের ট্রিগার টিপলেন। প্রচণ্ড শব্দ করে গুলি বেরিয়ে গেল। কিন্তু এমনিই কপাল যে ইজরাইল সেই মুহূর্তে মাথা নীচু করল, আর গুলিটা তার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ইজরাইল প্রস্তুত হয়ে কামান দাগল।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে কামানের গোলা ছুটে এল। ভাগ্য ভালো, গোলাটা নৌকার গায়ে লাগল না। নৌকার উপর দিয়ে একটা আগুনের গোলা সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল। নৌকার উপর পড়লে আর দেখতে হত না। সবশুদ্ধ থেঁতলে কিমা পাকিয়ে জলের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যেতাম। সেটুকু আর গেলাম না। কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়ে গেল। কামানের গোলায় সমুদ্রের জল এমন ফুলে উঠল যে বোট গেল ডুবে। জিনিসপত্র নিয়ে আমরাও জলে ডুবে গেলাম। অস্ত্রশস্ত্র সব জলের মধ্যে। ক্যাপ্টেন স্মলেট অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি তাঁর বন্দুকটা মাথার উপর উঁচু করে তুলে ধরে রেখেছিলেন বলে সেটা ভেজেনি। আমরা সবাই হাবুডুবু খেতে খেতে তীরে উঠলাম। ক্যাপ্টেনও কোন মতে বন্দুকটা মাথার উপর উঁচু করে রেখে তীরে উঠলেন। ওটাই এখন এতগুলো মানুষের প্রাণরক্ষক। ডাঙ্গায় উঠতেই দেখি লং জন দলবল নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে আসছে।

ডাক্তার এই পর্যন্ত বলার পর আমি বললাম, তারপর কি ঘটল তা আমি জানি। কামানের গোলার শব্দ পেয়েই তো আমি আপনাদের দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। প্রাণপণে ছুটছিলাম আপনাদের দিকে।

তবে জঙ্গল আর পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ছোটা কি সোজা। ভাগ্যিস বেন গান ছিল। সেই আমাকে সোজা পথ বাতলে দিল।

—বেন গান কোথায়? ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

—বেন গান তার গুহায় চলে গেছে। আমি বললাম।

—বেন গানের সাহায্য চাই। ট্রিলনী বললেন, ওর সাহায্য পেলে আমাদের পক্ষে কাজ করা খুব সুবিধা হবে।

—চল জিম, কাল সকালেই আমরা যাব বেন গানের গুহায়। ডাক্তার বললেন।

—বেন গান সানন্দে আমাদের সাহায্য করবে। আমি বললাম, ফেরার সময় ওকে আমরা দেশে নিয়ে যাব।

—নিশ্চয়ই। ট্রিলনী বললেন।

গল্পগুজবে রাত্রি কেটে গেল।

॥ লং জনের বজ্জাতি ॥

পরদিন খুব সকালে আমার ঘুম ভাঙল।

রত্নদ্বীপে প্রথম সকাল।

দুর্গের দরজার কাছে আগুন জ্বালিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আগুনটা নিবু নিবু হয়ে এসেছে।

আমি দুর্গের চারদিকটা ঘুরে ফিরে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম সেই ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের কথা। লোকটা কি কৌশলেই না দুর্গটা বানিয়েছিল। এর মধ্যে থেকে শত্রুর সঙ্গে দিব্যি লড়াই করা যায়। ভিতর থেকে গুলি ছুঁড়বার জন্য কাঠের গায়ে ছোট ছোট খোপ করা হয়েছে।

হঠাৎ এই সময় বাইরে শোনা গেল হট্টগোল। কাঠের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি লং জন পেছনে তার দল নিয়ে দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে। দলের সবার হাতেই বন্দুক।

আমি ছুটে গিয়ে ডাক্তার ট্রিলনী সবাইকে জাগিয়ে দিলাম। শীগগীর উঠুন। লং জন দুর্গ আক্রমণ করতে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা প্রস্তুত হয়ে আমার সঙ্গে দৌড়ে এলেন। ট্রিলনী বন্দুক তুললেন ফায়ার করবার জন্যে।

সেই সময় লং জন দু হাত উপরে তুলল। এক হাতে তার সাদা একটা পতাকা।

ডাক্তার ট্রিলনীকে বললেন, লং জন শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। তার মানে ও আপোষ চায়। ব্যাপারটা কি?

—গুলি ছুঁড়বো না তাহলে? ট্রিলনী বললেন।

—কেউ শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দিলে গুলি ছোঁড়া বেআইনী কাজ।

ক্যাপ্টেন স্মলেট গম্ভীরস্বরে বললেন, ওর কাছে বরঞ্চ জানতে চাওয়া হোক, ও কি চায়।

—সেই ভাল। আমি বললাম, লং জন এলে অনেক কিছু জানা যাবে।

—ক্যাপ্টেন স্মলেট, আপনি বরঞ্চ চোঙ্গা মুখে লং জনকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কি বলতে চায়?

—ঠিক আছে স্যার। ক্যাপ্টেন স্মলেট চলে গেলেন। একটু পরেই তিনি একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে চোঙ্গা মুখে নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, লং জন আমরা তোমার শ্বেত পতাকা দেখতে পেয়েছি। তোমার কি বক্তব্য আছে জানাও।

লং জন চেঁচিয়ে বলল, আমরা তোমাদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চাই।

স্মলেট বললেন, ঠিক আছে, তোমাদের মধ্যে একজন নিরস্ত্র অবস্থায় ভিতরে আসতে পারো।

ওরা নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করে নিল। তারপর লং জন লাঠি ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভিতরে ঢুকল।

ঢুকেই প্রথমে বলল, আপনাদের এসব কি জঘন্য আচরণ।

রাত্রির অন্ধকারে আমাদের শিবিরে হানা দিয়ে একজন ঘুমন্ত নাবিকের মাথা গুঁড়ো করে দিয়ে এসেছেন। লড়তে হয় দিনের আলোকে সামনাসামনি লড়ুন। রাতের আঁধারে চোরের মতো কেন!

—আমরা তোমার কথা শুনে খুব অবাক হচ্ছি। ডাক্তার বললেন, চোরের মতো রাতের আঁধারে তোমাদের শিবিরে হানা দিয়ে কাউকে মেরে ফেলার মতো মনোবৃত্তি আমাদের কখনো ছিলও না, বা ভবিষ্যতেও হবে না।

—আপনি কি বলতে চান, আমাদের কোন লোককে আপনারা মেরে ফেলেন নি?

—আমি সর্বস্ব বাজি রেখে বলতে পারি, ট্রিলনী বললেন, আমাদের কোন লোক তোমাদের কোন লোককে মেরে ফেলেনি।

—তাহলে আমাদের শিবিরে গিয়েছিল কে? আপনি কি বলতে চান, এ রত্নদ্বীপের ভূতের কাণ্ড?

—ভূতের কাণ্ড কিনা জানি না, তবে আমাদের কাণ্ড নয়। আমি হলফ করে বলতে পারি।

ডাক্তার বললেন, ব্যাপারটা কি খুলে বলো তো জন। এ বিষয়ে আমাদেরও কৌতূহল হচ্ছে।

—আরে মশাই, সারা দিনটায় যে কি ধকল গেছে, সে তো আপনারা সবই জানেন। রাত্তিরে আমাদের শিবিরে একটু নিশ্চিন্ত মনে শুয়েছি, জানি, আর যাই হোক, আপনারা রাত্তিরে আসবেন না। রাত্তিরে শুয়েছি, সকালবেলা উঠে দেখি আমাদের এক সাথীর গলা কাটা। কেউ এসে বেশ নিপুণ হাতে গলা কেটে রেখে চলে গেছে। আমাদের খুব রাগ হল। তাই আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে এলাম, এ কি ব্যবহার আপনাদের।

ট্রিলনী বললেন, আমরা তো বারবার বলছি, এ আমাদের কারোর কাজ নয়। রাত্তিরে আমাদের দলের কেউই দুর্গের বাইরে যায়নি।

—অবাক কাণ্ড। লং জন বিড় বিড় করে বলল, তাহলে এটা কার কাজ?

—কার কাজ সে নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও গে। এখন তোমার অন্য কোন কথা থাকে তো বল।

—অন্য কথাও আছে, লং জন বলল, এই রত্নদ্বীপে যে গুপ্তধন আছে, আপনারা তা বেআইনীভাবে নিতে এসেছেন।

—তার মানে? ট্রিলনী অবাক হয়ে বললেন, তুমি কি বলতে চাও খুলে বলো।

—দেখুন, এখানে যে গুপ্তধন আছে, তা ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের সম্পত্তি। ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্ট লুটপাট করে বছরের পর বছর ধরে এখানে গুপ্তধন জমা করেছিল। ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের অধীনে কাজ করে আমরাই এ ধন সম্পদ সংগ্রহ করেছিলাম। ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্ট মারা গেছে। এখন আমরাই এ ধন সম্পদের আসল দাবীদার। আপনারা বেআইনী ভাবে এ ধন সম্পদ নিতে এসেছেন।

—ঠিক। ঠিক। চমৎকার তোমার যুক্তি। ডাক্তার বললেন, তোমার যুক্তি মেনে আমাদের চলে যাওয়াই উচিত।

—আপনি বিজ্ঞ; তাই কথাটা এত সহজে বুঝতে পারছেন, লং জন উৎসাহভরে বলতে লাগল, ভেবে দেখুন, আপনাদের সঙ্গে এই রত্নদ্বীপের গুপ্তধনের কোন সম্পর্কই নেই। আপনি হচ্ছেন ডাক্তার মানুষ, আর ট্রিলনী হচ্ছেন জমিদার ধনী। এই রত্নদ্বীপের নক্সাটা হঠাৎ আপনাদের হাতে এসে পড়েছে বলেই তো আপনারা এখানে এসেছেন। এখানকার এই বিপুল ধনরত্ন আপনারা জমা করেন নি, জমা করেছি আমরা। অতএব এ ধনরত্নে আমাদেরই ন্যায্য অধিকার। আপনারা বরঞ্চ নক্সাখানা আমাদের দিয়ে দেশে ফিরে যান। আমরা আপনাদের কোন ক্ষতিই করব না।

—জন তার বক্তৃতা শেষ করলে ডাক্তার বললেন, আর যদি আমরা না ফিরে যাই?

জন বলল, না ফিরে গেলে আপনারা পস্তাবেন। এই গুপ্তধনের জন্যে যত লোক মারা পড়বে, সব দায় দায়িত্ব আপনাদের। তবে আশা করি দেশে না ফেরার মতো দুর্মতি আপনাদের হবে না।

ক্যাপ্টেন স্মলেট এতক্ষণ বহু কষ্টে ধৈর্য ধরেছিলেন। এবার বললেন, থামো, থামো। আর কিছু বলবার আছে?

লং জন হকচকিয়ে বলল, না আমাদের আর কিছু বলবার নেই। এবার আপনারা বলুন।

ক্যাপ্টেন ট্রিলনীর দিকে তাকাতে তিনি ইসারা করলেন। অর্থাৎ স্মলেটই যা বলবার বলুন।

ক্যাপ্টেন স্মলেট বললেন, ছ্যাখ হে এই রত্নদ্বীপের গুপ্তধনের উপর তোমরা যে দাবী করছো, তা একেবারে বাজে। বহু লোককে লুটপাট করে এখানে গুপ্তধন জমা করা হয়েছে। এই ধনের উপর সকলেরই দাবী আছে। যে নিজের ক্ষমতায় এগুলো উদ্ধার করতে পারবে, এ ধন তারই।

জন বলল, তাহলে নক্সাটা আমাদের দিয়ে দিন।

—মামা বাড়ির আবদার। নক্সা চাইলে আর নক্সাটা দিয়ে দেবো। কিছু দেওয়া-টেওয়া হবে না। যাও এখন পালাও।

—ঠিক আছে। আমরাও দেখে নেবো, আপনারা এখান থেকে কি করে গুপ্তধন নিতে পারেন। জান দেবো তবু স্বীকার, কিন্তু গুপ্তধন নিতে দেব না।

—যাও যাও। তোমাদের মুরোদ আমাদের জানা হয়ে গেছে। ট্রিলনী বললেন, যা পারো করো।

লং জন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলল, নিশ্চয় করবো। এর শোধ আমরা নেবো। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বুঝতে পারবেন যে কি ভুল আপনারা করলেন।

—যাও যাও কেটে পড়ো। ট্রিলনী বিরক্ত হয়ে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। আর সহ্য করতে পারছি না তোমাকে।

লং জন উঠে দাঁড়াল।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল।

বাইরে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আর আধ ঘণ্টা—আধ ঘণ্টার মধ্যে তোদের এই দুর্গ আমরা উড়িয়ে দেবো। দেখি কে তোদের রক্ষা করে।

জন বাইরে বেরিয়ে গেল। ওর সাথীরা ধারে কাছে অপেক্ষা করছিল। ও বোধহয় তাদের কিছু বলল। আর সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে অনেকে গর্জন করে উঠল। শেষ করবো, গুঁড়িয়ে দেবো।

আমরা ভিতরে গিয়ে তৈরী হতে লাগলাম।

॥ দস্যুদলের সাথে লড়াই ॥

আমরা বুঝতে পারলাম, লং জন মিথ্যে ভয় দেখায়নি। ওরা এবার মরীয়া হয়ে চেষ্টা করবে। সুতরাং আমাদেরও তৈরী থাকা দরকার। আমাদের মধ্যেও সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

আমরা আমাদের কাঠের দুর্গের চারধারে ফুটোর মধ্যে বন্দুকের নল পুরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কাউকে আসতে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি।

আমাদের পক্ষে গুলি করা একটু মুস্কিল। কারণ দুর্গের বাইরে থেকেই ঘন গাছপালা। গাছপালার আড়াল থেকে আমাদের দিকে গুলি করা সোজা। কিন্তু আমাদের পক্ষে নিশানা ঠিক করা কঠিন।

আধ ঘণ্টার জায়গায় এক ঘণ্টা চলে গেল। কোন সাড়াশব্দ নেই। আমাদের কাজেকর্মে একটু ঢিলাভাব।

হঠাৎ আমাদের কারো বন্দুক গর্জে উঠল। আমার একটু দূরেই ছিল জয়েস। তাকিয়ে দেখি জয়েস আবার গুলি ভরছে।

এরপরই যেন ঝড় বয়ে গেল।

বাইরে থেকে বৃষ্টির মতো গুলি এসে পড়তে লাগল দুর্গের কাঠের দেয়ালে।

আমরাও সমানে গুলি দিয়েই উত্তর দিতে লাগলাম।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। ওরা পালিয়ে গেল নাকি?

আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, দুর্গের উত্তর দিক থেকেই গুলি বৃষ্টি বেশী হয়েছিল। তাই অনুমান করেছিলাম, দস্যুদল ওইদিকেই জমায়েত হয়েছে।

আমরা উত্তর দিকে জঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখলাম।

হঠাৎ অন্য দিক থেকে গুলি ছুটে আসতে লাগল দুর্গের দিকে।

আমরা সেই দিক লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে লাগলাম।

আর ঠিক সেই সময় বিরাট চিৎকার করে একসাথে অনেক-গুলো দস্যু তীর বেগে ছুটে আসতে লাগল দুর্গ লক্ষ্য করে। আর তাদের দুপাশ দিয়ে গুলির বৃষ্টি হতে লাগল দুর্গের দিকে। আমরা বুঝতে পারলাম, দু দিক থেকে দু দল দস্যু এমনভাবে গুলি ছুঁড়ছে যাতে মাঝখানের দস্যুদল দুর্গের কাছে আসতে পারে।

একটা গুলি এসে পড়ল ডাক্তারের বন্দুকের উপর। গুঁড়ো হয়ে গেল বন্দুকটা।

দস্যুদল আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কিভাবে যেন দুর্গের প্রাচীরের উপর উঠে পড়ল।

ট্রিলনী ও আব্রাহাম গ্রের লক্ষ্য খুব ভালো। তাদের গুলিতে আহত হয়ে তিন জন দস্যু পড়ে গেল নীচে।

কিন্তু এর মাঝেই আর চার জন দস্যু ভিতরে লাফিয়ে পড়ে ছুটে আসতে লাগল এঁকে-বেঁকে। আমরা সমানে গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছি। কিন্তু একটা গুলিও তাদের গায়ে লাগল না। দেখতে দেখতে তারা একেবারে ভিতরে এসে পড়ল।

সবার আগে জন এণ্ডারসন নামে একজন নাবিক। সে চেঁচিয়ে বলল, সকলে একসাথে আক্রমণ কর।

ভিতরে ঢুকে কে একজন হাণ্টারের বন্দুকটা কেড়ে নিল। আর একজন খোলা তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাক্তারের উপর।

ঘরের ভিতর বারুদের ধোঁয়া। ভালো করে কিছু দেখা যায় না।

ক্যাপ্টেন স্মলেট চেঁচিয়ে বললেন, সবাই এবার তরোয়াল ধর।

এক কোণে তরোয়াল লুকানো ছিল।

আমি একটা তরোয়াল টেনে নিতে কে যেন তরোয়াল দিয়ে আমার হাতে এক কোপ মারল। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। হাত কেটে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। সে দিকে আর লক্ষ্য করার সময় ছিল না। আমি রক্ত ঝরা হাত নিয়েই তরোয়াল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

দেখি ডাক্তার এক দস্যুকে তরোয়াল দিয়ে আঘাত করছেন। ডাক্তারের তরোয়ালের আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি ঘরের পূবদিকে যেতেই সামনে পড়ল এণ্ডারসন। চিতা বাঘের মতো চোখ জ্বলছে। সে তার বিরাট তরোয়াল তুলল আমাকে শেষ করে দেবার জন্যে। আমি লাফ দিয়ে পাশে সরে যেতে পড়ে গেলাম।

এণ্ডারসন তেড়ে এল আমার দিকে।

কিন্তু এ কি! কাটা কচুগাছের মতো সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। দেখি তার পিছনে দাঁড়িয়ে আব্রাহাম গ্রে। তার তরোয়াল এণ্ডারসনের পিঠে আমূল বেঁধানো।

একটু দূরে আর একটা নাবিক দস্যু পড়ে আছে। আমাদের দলের কেউ গুলি করে তাকে মেরে ফেলেছে।

চার জনের মধ্যে তিন জন খতম। একজন কোন রকমে পালিয়ে গেছে কোন ফাঁক দিয়ে।

আমরা চারদিক ঘুরতে লাগলাম। আমাদের দলের জয়েস মারা গেছে। হাণ্টার গুরুতর আহত। ক্যাপ্টেন স্মলেটও রক্তাক্ত দেহে মাটিতে শুয়ে।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি ক্যাপ্টেন ও হাণ্টারের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

হাণ্টারের অবস্থা খুবই খারাপ।

ডাক্তার অনেক চেষ্টা করলেন তাঁকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই তাকে বাঁচানো গেল না।

রেডরুথকে দুর্গের মধ্যে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল, জয়েস আর হাণ্টারকেও তার পাশে কবর দেওয়া হল।

আমাদের সবার মনই খুব ভারাক্রান্ত। গুপ্তধনের জন্যে বেরিয়ে কোথায় কোন অজানা জায়গায় এদের মরতে হল। এই প্রেত-ভূমিতে এদের চিরকাল থাকতে হবে, একথা কে ভেবেছিল।

এর মধ্যেই দু পক্ষের অনেকে মারা গেছে।

আরও কজন মরবে কে জানে।

শেষ পর্যন্ত আমরা ফিরতে পারব তো ?

॥ সমুদ্রের জলে ভেসে গেলাম ॥

আমি বিষণ্ণ মনে বসেছিলাম।

ডাক্তার ট্রিলনীর সঙ্গে নীচুস্বরে পরামর্শ করছেন। ক্যাপ্টেন স্মলেট ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় শুয়ে।

ওদের আলোচনায় আমাকে ডাকছেন না। তাই আমি আর গেলাম না। তবে বার কয়েক 'বেন গান' 'বেন গান' কথাটি শুনলাম। তবে বুঝতে পারলাম, ওরা সম্ভবত বেন গানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান।

আমার অনুমান সত্যি। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, ডাক্তার একটা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

আমার মনটা অভিমানে ভরে গেল। আমি না হয় ছোট ছেলে।

কিন্তু ছোট ছেলের মতো ব্যবহার তো আমি করিনি। আমার কাছে একবার বেন গানের কথা বললেন না ওরা। আমি তো বেন গানকে প্রথম আবিষ্কার করেছি। আমিই তো সহজে খুঁজে দিতে পারতাম বেন গানকে।

কিন্তু আমার কাছে বেন গানের কথা কিছু না বলে ডাক্তার একাই গেলেন বেন গানের কাছে।

ঠিক আছে। আমিও আর ওদের কিছু বলবো না।

সেই মুহূর্তে আমি মনে মনে ঠিক করে নিলাম, রাতের আঁধার নামলেই আমি একাই বেরিয়ে পড়বো। কোন মতে বেন গানের নৌকোটা খুঁজে বের করতে পারলে অনেক উপকার হবে।

বেন গান তো কথায় কথায় বলেছিল, নৌকোটি তার এমন নৌকো যে তা সমুদ্রের জলে কখনো ডুবে যাবে না। দেখা যাক বেন গানের কথা সত্যি কিনা।

বাইরে বেরুবার জন্য আমার মন অস্থির হয়ে উঠল। রাত্তির হতে এখনও অনেক দেরী।

এক সময় দেখলাম, আশেপাশে কেউ নেই। আব্রাহাম গ্রে ও ট্রিলনী ক্যাপ্টেনের ঘরে।

আমি একটা পিস্তল ছোরা আর কিছু খাবার নিয়ে প্রাচীর টপকে বাইরে লাফিয়ে পড়লাম।

উত্তর দিকের জঙ্গলে জনের দল হয়তো ঘাঁটি গেড়েছে। তাই আমি পূব দিক দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। ঘন গাছপালার আড়াল দিয়ে চলতে চলতে কথাবার্তার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। দেখি লং জন দলবল নিয়ে বসে আছে একটা নৌকোর মধ্যে। দলবল বলতে পাঁচ-ছ জন মানুষ। তাহলে ওদের দলে আর বেশী মানুষ নেই। লং জনের দলের বেশ কয়েক জন মানুষ মারা গেছে। কিন্তু তাতে ওদের দুঃখ নেই। বরঞ্চ ওরা বেশ স্ফুর্তিতেই আছে মনে হল। আর থাকারই তো কথা। গুপ্তধনের ভাগীদার কমে

গেছে। যত লোক কমে যায়, ততই ওদের পক্ষে ভালো। ধনরত্নের ভাগ দিতে কেউই চায় না।

লং জনের দল বেশ মেজাজেই আছে। সবার হাতে মদের বোতল। বোতল থেকে চুমুক দিতে দিতে ওরা গান গাইছে।

জনের হাতের উপর বসে আছে সেই পাখিটা। গানের তালে তালে সে কর্কশ গলায় হেঁকে উঠছেঃ আট মোহরী গিনি, আট মোহরী গিনি।

বেশ ফুর্তিতেই আছে ওরা।

আমি গাছের আড়াল দিয়ে খাড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। এখানেই কোথাও বেন গানের নৌকো আছে বেন গান বলেছিল। আরো কিছুদূর এগোতে আমার সামনে পড়ল একটি টিলা। টিলার নীচের দিকটা খুঁজতে লাগলাম। নীচটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা। একটা বড় লাঠি দিয়ে ঝোপঝাড় সরাতে সরাতে একটি বড় গর্তের সন্ধান পেলাম। গর্তের মুখ এমনভাবে ঢাকা যে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না।

আমি গর্তের মধ্যে নেমে একটু এগোতেই বেন গানের নৌকোর দেখা পেলাম।

ভারী মজার নৌকো তো। একেবারে ক্ষুদে নৌকো। একটা মানুষ কোনমতে বসতে পারে। ভালো করে দেখে বুঝলাম, নৌকোটা হালকা শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরী। খোলের ভিতরটা ছাগলের চামড়া দিয়ে ঢাকা। এর ফলে তলা দিয়ে জল উঠবে না। নৌকোটা খুব হালকা সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যি সত্যি কি জলে ডুববে না? কে জানে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অসংখ্য পাখি কিচির-মিচির করতে করতে গাছের ডালের বাসায় ফিরে আসছে।

বেন গানের নৌকো খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু বেন গান কোথায়? মরুক গে বেন গান।

আমি এখন কি করি ?

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

এই ছোট্ট নৌকোটা নিয়ে আমাদের জাহাজে চলে গেলে কেমন হয় ?

জাহাজে হয়তো দু-চার জন নাবিক আছে। জাহাজের কাছে গিয়ে কাছির দড়িটা কেটে দিলে কেমন হয় ? নোঙর ছাড়া অবস্থায় জাহাজটা ঘুরপাক খাক।

যেমন ভাবা তেমন কাজ।

আমি হালকা নৌকোটা টানতে টানতে খাড়ির জলে নিয়ে এলাম। তারপর নৌকোয় উঠে দাঁড় বাইতে লাগলাম জাহাজের আলো লক্ষ্য করে।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হয়েছে। কেউ আমাকে দেখতে পেল না। জাহাজের আলো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল। আমাকে বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি। ভাটির টানে নৌকোটা জাহাজের কাছেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

জাহাজের মোটা কাছি চোখে পড়তেই আমি সেটা ধরে ফেললাম। তারপর ছোরা বের করে কোপ দিতে লাগলাম কাছির উপর।

বাপ রে বাপ। অত মোটা কাছি কাটা কি সোজা কথা। আমার ঘাম বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর কাছিটা আমি কেটে ফেললাম। তারপর দাঁড় বেয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম জাহাজের দিকে।

কিন্তু এ কি। জাহাজ যে ক্রমশ আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

জাহাজও ছুটছে। আর পেছন পেছন আমার নৌকোটাও ছুটছে। আমি সমানে দাঁড় টেনে চলেছি কিন্তু জাহাজের কাছে পৌঁছোতে পারছি কই।

ভাটির টানও যে ক্রমশ বেড়ে চলছে। আমি কিছুতেই আমার নৌকোটাকে সামাল দিতে পারছি না।

এবার আমার ভয় হল। এরকম হলে তো জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে আমার নৌকোটাও খাড়ির মুখ ছাড়িয়ে বড় সমুদ্রে ভেসে যাবে। তারপর? তারপর সেই অথৈ জলের মধ্যে আমার তো কিছুই করার থাকবে না।

আমি এবার প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম নৌকোটিকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে। দাঁড় টানতে টানতে আমার হাত যেন ছিঁড়ে যেতে লাগল।

কিন্তু কার সাধ্য নৌকো ফেরায়।

নৌকোটা সোজা সামনের দিকে তীরের মতো ছুটতে লাগল।

ক্লান্তিতে আমার শরীর ভেঙে পড়ছে। আমি জীবনের আশা ছেড়ে দিলাম। দাঁড় ছেড়ে দিয়ে আমি নৌকোর পাটাতনের উপর শুয়ে পড়লাম।

আঃ। কি আরাম। সমুদ্রের হাওয়া সারা শরীরে স্নিগ্ধ নরম হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ঘুমে আমার চোখ বুঁজে এল।

॥ আমি বন্দী ॥

পরদিন সকালে চোখ মেলে দেখি অবাক কাণ্ড। আমার সেই ছোট্ট নৌকোটা তর তর করে ভেসে চলেছে। আর জাহাজটাও ঠিক আগের মতোই আমার নৌকোর আগে আগে চলেছে।

প্রথমটা মনে হল, আমি বোধহয় অকূল সাগরে ভেসে চলেছি। কিন্তু ভালো করে তাকাতেই দেখি, সেই রত্নদ্বীপের কাছাকাছিই আছি। ওই তো দেখা যাচ্ছে রত্নদ্বীপের জঙ্গল আর পাহাড়।

জাহাজ তাহলে খাড়ি ছেড়ে বড় সাগরে ভেসে যায়নি।

আমার নৌকোটাও জাহাজের পিছন পিছন ঘুরছে ল্যাঙ বোটের মতো। এত দুঃখেও হাসি পেলো।

খাড়ির বুকে একটা প্রবল স্রোত বরাবর উত্তর মুখে চলে গেছে। এই স্রোতই বড় বড় ঢেউয়ের আকারে কূলে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্র শান্ত হলেও কূলের কাছে ঢেউয়ের মাতামাতি।

আমি বুঝতে পারলাম, এই সামুদ্রিক স্রোতই আমার নৌকো আর জাহাজকে খাড়ির মধ্যে আটকে রেখেছে।

আস্তে আস্তে রোদ ভীষণ কড়া হয়ে উঠল। সমুদ্রের জলের উপর যেন আগুনের শিখা। দাঁড় টানতে টানতে আমার শরীর অবসন্ন। প্রচণ্ড পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

এবার বোধহয় পিপাসায় প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

চারধারে এত জল। অথচ একটু জল মুখে দেবার উপায় নেই।

আমাকে এবার যে করেই হোক জাহাজে উঠতেই হবে। জাহাজে মিষ্টি জল আছে।

কিন্তু আমি তো দাঁড় টেনে কিছুতেই জাহাজের কাছে পৌঁছতে পারছি না। ওই সামুদ্রিক উত্তরমুখী স্রোত কিছুতেই আমাকে জাহাজের কাছে পৌঁছোতে দিচ্ছে না।

এমন সময় সমুদ্রের বুকে প্রবল বাতাস বইতে লাগল।

জাহাজের পাল বাতাসে খুলে উঠল।

এবার আর উত্তরমুখী স্রোত জাহাজটাকে টানতে পারল না।

জাহাজ ভাসতে ভাসতে এবার আমার দিকেই আসতে লাগল। জাহাজের মোটা দড়ি আমার নৌকোর কাছে আসতেই আমি দড়ি ধরে ঝুলে পড়লাম।

আমার পায়ের ধাক্কায় বেন গানের সেই ছোট্ট নৌকোটা কাত হয়ে পড়ল। গল গল করে জল উঠতে লাগল নৌকোর খোলে।

আমি দড়ি ধরে একটু একটু করে উপরে উঠতে লাগলাম।

হাত যেন ছিঁড়ে পড়ছে। একটু হাত আলগা হলেই সোজা জলের মধ্যে। তারপরে আর দেখতে হবে না। হাঙরের পেটে।

বহু কষ্টে ঝুলে ঝুলে আমি জাহাজের পাটাতনে পা দিলাম। পা আমার থর থর করে কাঁপছে।

আমি কাঁপতে কাঁপতে জাহাজের পাটাতনে বসে পড়লাম।

আমার ওঠার শক্তি ছিল না।

এদিকে পিপাসায় প্রাণ যায় যায়।

কোনমতে টলতে টলতে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

জাহাজে কোথায় মিষ্টি জল থাকে, তা আমার জানা আছে। টলতে টলতে সেদিকে গিয়ে ট্যাপ খুলে আকণ্ঠ জল খেলাম। আঃ। প্রাণটা যেন ভরে গেল। জল যেন আমার মধ্যে নতুন করে জীবন এনে দিল। এই জন্যে জলের আর এক নাম জীবন।

জল খেয়ে আমার মনে আবার সাহস ফিরে এল। এখন আমি অনেক কাজ করতে পারি।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমার খুব অবাক লাগল। জাহাজে এতক্ষণ আছি; অথচ একটা লোক চোখে পড়ল না। জাহাজে তো জনের কিছু লোক পাহারায় ছিল। তারা সব গেল কোথায়।

আমাকে কি কেউ এতক্ষণের মধ্যে লক্ষ্য করল না?

নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে।

আমি সাবধানে পা ফেলে জাহাজের নানা জায়গায় ঘুরতে লাগলাম।

নাঃ। কোথাও কোন লোক নেই।

এ যেন ভৌতিক জাহাজ।

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পাওয়া গেল। উপর ডেকের এককোণে মেঝের উপর একটা মানুষ পড়ে আছে। বুকের উপর মস্ত বড় একটা ছোরা বেঁধানো। জামা লালে লাল। দেখে মনে হচ্ছে

মারা গেছে। আর একজন ডেকের রেলিং-এ ঠেসান দিয়ে বসে আছে চোখ বুজে।

লোকটাকে আমি চিনতে পারলাম। এ সেই ইজরায়েল হ্যাণ্ডস।

সামনে অনেকগুলো মদের বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। হ্যাণ্ডস-এর জামা প্যান্ট রক্তে ভেজা।

আমি বুঝতে পারলাম, মারামারি করার ফলে দুজনের এই অবস্থা।

মেঝেতে যে পড়ে আছে, সে তো মরেই গেছে বুঝতে পারছি। কিন্তু ইজরায়েল এভাবে বসে কেন ?

আমি কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিলাম। কোন সাড়াশব্দ নেই। নাকের সামনে হাত দিয়ে দেখলাম নিঃশ্বাস পড়ছে। তবে বেঁচে আছে !

আমি ইজরায়েলের শরীর ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ও গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর।

বুঝলাম, একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

জল এনে ইজরায়েলের চোখে মুখে অনেকক্ষণ ধরে ঝাপটা দিলাম।

কিছুক্ষণ পর চোখ মেলল ইজরায়েল। আর চোখ মেলেই তার প্রথম কথা হল, মদ দে।

আমি তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে সেলার থেকে এক বোতল মদ এনে দিলাম।

ইজরায়েল বোতলের মুখ ভেঙে সবটুকু মদ একবারে গলায় ঢেলে দিয়ে একটু চাঙ্গা হল।

ওর সারা গা মাথা মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। এতে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই ওর।

আমি কিভাবে জাহাজে এলাম সে সম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করল না। অবশ্য জিজ্ঞাসা করবার মতো অবস্থাও ওর ছিল না।

আমিও কোন প্রশ্ন করলাম না।

শুধু বললাম, জাহাজ তো জলে ভেসে চলেছে। এটাকে কোন-মতে কূলে ভেড়াতে হবে।

—জাহাজ জলে ভেসে চলেছে? ইজরায়েল অবাক হয়ে বলল, এটা কি করে হল? জাহাজ তো কাছিতে বাঁধা ছিল।

—বাঁধা ছিল। কোনমতে হয়তো কাছির দড়ি ছিঁড়ে গেছে। এখন উপায় কি? আমি বললাম!

—জাহাজটাকে এখন যে করেই হোক উত্তর খাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের সঙ্গে ঘোরার সময় আমি জায়গাটা একবার দেখে রেখেছিলাম।

—তাহলে সেই উত্তর খাড়িতেই জাহাজটাকে নিয়ে চল না কেন?

—অত সোজা নাকি? জাহাজের দড়িদড়া টানবার মতো অবস্থা আমার নেই।

—দড়িদড়া আমি টানবো।

—পারবে?

—নিশ্চয় পারবো।

—ঠিক আছে। তুমি যদি আমার কথা মতো কাজ কর, তাহলে আমি জাহাজটাকে উত্তর খাড়িতে নিয়ে যাবো।

—ঠিক আছে। তুমি কাজ আরম্ভ করো। আমি রেডি।

ইজরায়েল উঠে দাঁড়াল। এরপর সে মেসিন ঘরের মধ্যে চলে গেল। সেখানে কি সব যন্ত্র চালু করে আমাকে নানা নির্দেশ দিয়ে চলল—

—ঐ দড়িটা আলগা করে দাও।

—বাঁ পাশের দড়িটা টেনে বাঁধো।

—ওই চাকাটা ডানদিকে ঘোরাও।

ইজরায়েলের প্রতিটি নির্দেশ পালন করলাম। শরীর ভিজে গেল

ঘামে। জাহাজটি বাধ্য ছেলের মতো উত্তর খাড়ির দিকে মুখ করে ছুটতে লাগল।

খাড়ির মধ্যে ঢোকামাত্র ইজরায়েল নোঙর ফেলে দিল। আমি একটু নিশ্চিন্ত মনে যেমনি ডেকের উপর বসতে গেছি, ঝাঁ করে একটা ছোরা ছুটে এল আমার দিকে।

আমি ক্ষিপ্র গতিতে বাঁ পাশে সরে যেতেই ছোরাটা আমার কাঁধের মাংসে সোজা বিঁধে গেল।

তাকিয়ে দেখি যমদূতের মতো ইজরায়েল আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

রাগে আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম। পিস্তলটা টেনে নিয়ে ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম।

ও দুহাতে বুক চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ছটফট করতে করতে ওর শরীরটা স্থির হয়ে গেল। বুঝলাম, ইজরায়েল শেষ হয়ে গেছে।

আমি কাঁধ থেকে ছোরাটা টেনে বের করলাম। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। জাহাজের ফার্ষ্ট এড বক্স থেকে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ক্ষতটা বেঁধে ফেললাম। তারপর মৃতদেহ দুটো টানতে টানতে ডেকের ধারে নিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিলাম। এরপর জাহাজের একটা বোটে চড়ে কূলে এসে উঠলাম। খুঁজে খুঁজে আমাদের সেই কাঠের দুর্গে পৌঁছোতে বেশ রাত হয়ে গেল।

দুর্গের ভিতর ঢুকে দেখি কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। কোন পাহারাও নেই।

আমার ভীষণ অবাক লাগল। ডাক্তার—ট্রিলনী—এরা সব কোথায়?

আমি এদিক ওদিক ওদের সকলকে খুঁজছি।

এমন সময় অন্ধকারের বুক চিরে কর্কশ শব্দে কে বলে উঠল, আট মোহরী গিনি, আট মোহরী গিনি।

সর্বনাশ। এ যে সেই ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের ময়না পাখির গলা।

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই কারা যেন আমার হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

সামনে দেখি লং জন দাঁত বের করে হাসছে। হাসতে হাসতে বলল,

—এতদিন পরে তোমাকে আমরা ধরে ফেললাম জিম।

রাগে ক্ষোভে আমার চোখে জল এল।

আমি বুঝতে পারলাম, এত কাণ্ডের পর শেষ পর্যন্ত আমাকে লং জনের হাতেই বন্দী হতে হল।

এরা আমাকে এবার নির্ঘাৎ মেরে ফেলবে। কিন্তু একটা কথা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না—এই দুর্গে লং জনের দল এল কি করে?

ওরা কি দুর্গ দখল করেছে? ট্রিলনী ডাক্তার এবং অন্য সবাইকে কি ওরা মেরে ফেলেছে?

ব্যাপার কি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

এদিকে আমাকে বেঁধে রেখে জনের সঙ্গে দলের অন্য সকলের ঝগড়া বেধে গেছে।

ওর দলের লোকেরা বলছে, জিমকে এখনই মেরে ফেলা হোক।

জন বলছে, মেরে ফেলে লাভ কি। বরঞ্চ ওকে বাঁচিয়ে রাখলে ওর নিরাপত্তার জন্যে আমরা ট্রিলনীর দলের কাছ থেকে অনেক কিছু সুবিধা আদায় করতে পারবো।

ওর দলের লোকেরা বলছে, সুবিধা না ঘোড়ার ডিম। আসলে জিমকে বাঁচিয়ে রাখায় তোমার স্বার্থ আছে।

—আমার আবার স্বার্থ কিসের? জন চটে উঠল।

—ট্রিলনীর দলের সঙ্গে তোমার হয়তো গোপনে কোন বোঝাপড়া হয়েছে।

—খবরদার। মুখ সামলে কথা বলবে বলছি। জন চেঁচিয়ে

উঠল, ট্রিলনীর দলের সঙ্গে আমার কোন গোপন বোঝাপড়া হয়নি।

—অত রোয়াব দেখিও না জন। গুপ্তধনের ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস নেই।

—আমাকে বিশ্বাস না কর, নিজেদের ব্যবস্থা নিজে করে নাও।

—শেষ পর্যন্ত তাই করে নিতে হবে।

গজ গজ করতে করতে জনের দলের লোকেরা কোথায় চলে গেল।

এবার জন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ব্যাপার-স্যাপার দেখে তোমার খুব অবাক লাগছে। তাই না মাষ্টার জিম?

—তা তো লাগছেই। আমি বললাম, তোমরা এ দুর্গে এলে কি করে?

—আমরা আসিনি। ট্রিলনী আর ডাক্তারই এ দুর্গ আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে। ওরা আমাদের সঙ্গে একটা আপোস করেছে। রত্নদ্বীপের ম্যাপও আমার হাতে দিয়ে গেছে। ঠিক হয়েছে, গুপ্তধন খুঁজে বের করে আমরাই তার দখল নেবো। ফেরার সময় জাহাজে করে ওদের দেশে নিয়ে যাবো।

আমি বুঝতে পারলাম, ওরা কিছু একটা মতলব করেই এ চালটা চেলেছেন।

—ডাক্তার এখন কোথায়?

—উত্তর খাড়ির কোথাও তারা থাকার জায়গা করে নিয়েছে।

জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি এমন সময় স্বয়ং ডাক্তার এসে হাজির।

এদের মাঝে আমাকে দেখে ডাক্তার তো ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন।

মুখে কিছু বললেন না বটে। কিন্তু বুঝতে পারলাম, তাঁর মনে

কোন একটা সন্দেহ জেগেছে। তিনি হয়তো ভেবে নিয়েছেন, আমি ওদের দল ত্যাগ করে জনের দলে যোগ দিয়েছি।

আমার হাত যে বাঁধা রয়েছে তা তিনি লক্ষ্য করেন নি।

ডাক্তার জনকে বললেন, কই তোমাদের কার কি ক্ষত হয়েছে দেখাও।

জনের দলের দু তিন জন গুরুতর আহত হয়েছিল। ডাক্তার তাদের পরীক্ষা করে ওষুধ দিলেন। তারপর জনকে বললেন, আমি জিমের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে দস্যুদল আপত্তি জানাল, না না জিমের সাথে কথা বলা চলবে না।

জন বলল, কথা বলবে তাতে হয়েছে কি। যান ডাক্তারবাবু, আপনি কথা বলুন।

জন আমাকে এক কোণে নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু সেখানে এসে প্রথমেই বললেন, তুমি এখানে কেন?

আমি তখন সংক্ষেপে সব কথা খুলে বললাম।

ডাক্তারবাবুর যেন তাতেও বিশ্বাস হয় না। তখন আমি তাঁকে দেখালাম, কিভাবে ওরা আমাকে বেঁধে রেখেছে।

ডাক্তারবাবু এবার বললেন, সাবাস জিম সাবাস। জাহাজটাকে তুমি একাই পুরোপুরি দখল করে ফেলেছ। আশ্চর্য। তোমার জন্যেই বারবার আমরা বেঁচে যাচ্ছি। তোমার কোন ভয় নেই। আমরা তোমার আশে পাশেই আছি।

জন এতক্ষণ দূর থেকে আমাদের উপর লক্ষ্য রাখছিল। এবার হেঁড়ে গলায় বলল, অনেক কথা হয়ে গেছে। এবার কেটে পড়ুন স্যার।

ডাক্তার আমায় বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন।

জন আমায় বলল, এবার খেয়ে-দেয়ে এক ঘুম দাও। সকালে তোমাকেও আমাদের সাথে বেরোতে হবে।

— কোথায় ?

—গুপ্তধনের খোঁজে। আমরা ম্যাপ হাতে পেয়েছি। এবার গুপ্তধন পেতে বেশী সময় লাগবে না।

আমার হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হল।

দস্যুদের সাথে আমাকেও খেতে দেওয়া হল।

খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ গুপ্তধন উদ্ধার ॥

পরদিন খুব ভোরে আমরা প্রাতরাশ সেরে নিলাম।

জন দল বল নিয়ে তৈরী হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন কোন যুদ্ধ জয়ে যাচ্ছে।

সেই রকমই ভাবভঙ্গী।

লং জন এদের সেনাপতি। সবার আগে আগে সে। হাতে তার সেই ম্যাপ।

কিছুদূর যায়, আর ম্যাপ খুলে খুলে ছাখে।

ম্যাপে লেখা আছে—পাহাড়ের ধারে লম্বা গাছ।

এই লম্বা গাছ খুঁজতে সবাই যেন ঘেমে গেল। লম্বা গাছ তো এখানে একটা নয়, অসংখ্য। কোন্ লম্বা গাছের কথা বলা হয়েছে, কে জানে।

ম্যাপ দেখে এগোতে এগোতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে।

একটা নরকংকাল মাটিতে শোয়ানো। হাত ছুটো মাথার পাশ দিয়ে সোজা ভাবে রাখা।

এ লোকটা নিশ্চয় ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের সেই ছয় সঙ্গীর একজন। ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট একে মেরে এইভাবে ফেলে রেখে গেছে।

হাত ছুটো মাথার পাশ দিয়ে সোজাসুজি রাখা কেন? যেন একটা সরল রেখা। কোন কিছুর ইঙ্গিত করছে।

নরকংকালটা দেখে দস্যুদলের মধ্যে গুঞ্জন উঠল।

জন চেঁচিয়ে উঠল, আরে ওই তো সেই লম্বা গাছ। সত্যিই তাই। নরকংকালটার হাত দুটো একটা বেজায় লম্বা গাছের দিকেই প্রসারিত।

তাহলে এই গাছের তলায় দশ ফুট নীচেই আছে সেই সাত রাজার ধন।

দস্যুদল হৈ চৈ করে ছুটে গেল সেই লম্বা গাছটার দিকে।

আমিও ওদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম।

হাঁপাতে হাঁপাতে সেই গাছের নীচে গিয়ে দেখলাম, বিরাট এক গর্ত খোঁড়া। আশে পাশে পড়ে আছে কয়েকটা ভাঙাচোরা বাক্স।

দস্যুদল সেই গর্তের দিকে তাকিয়ে রইল স্তব্ধ বিস্ময়ে। সেই বিরাট গর্ত যেন হাঁ করা অবস্থায় তাদের ব্যঙ্গ করছিল। তারা বুঝতে পারছিল যে যার জন্যে তারা এত কষ্ট করে এখানে এসেছে, সেই সাত রাজার ধন তাদের আগেই কেউ সরিয়ে ফেলেছে।

তারা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর হুড়মুড় করে লাফিয়ে পড়ল সেই গর্তের মধ্যে।

ভিতর থেকে ভেসে এল তাদের চিৎকার। গুপ্তধন না পেয়ে তারা পাগলের মতো হয়ে গেছে। পাগলের মতো চেঁচিয়ে গালাগাল করছে।

জন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ওরা আমাকে সন্দেহ করেছে। ভাবছে আমিই আগে সরিয়ে ফেলেছি। পালাও। পালাও।

কিন্তু পালাবো কোথায়।

সামনে বড় বড় গাছ। জন খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

আমিও দৌড়ে লুকোলাম একটা গাছের আড়ালে।

দস্যুদল বিকট চিৎকার করতে করতে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। সবার হাতেই ছোরা। একজনের হাতে বন্দুক।

বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ল ওরা।

আমরা গাছের আড়ালে ভগবানকে ডাকছি।

পাঁচজন দস্যু ছুটে আসছে আমাদের দিকে। আমাদের ওরা দেখতে পেয়েছে।

আর রক্ষা নেই। এবার সাক্ষাৎ মৃত্যু।

হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে দুটো বন্দুক একসঙ্গে গর্জে উঠল।

দুজন দস্যু আর্ত চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কে গুলি করল ওদের ?

সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ সরিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার।

তার পাশে আব্রাহাম গ্রে আর বেন গান।

ওদের বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

অন্য তিন জন দস্যু ওদের এক নজর দেখেই এক ছুটে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে।

ইতিমধ্যে আমি আর জন বেরিয়ে এসেছি গাছের আড়াল থেকে।

আব্রাহাম গ্রে জঙ্গল লক্ষ্য করে কয়েকবার গুলি ছুঁড়ল। তারপর দৌড়ে যেতে চাইল সেদিকে।

ডাক্তার বাধা দিলেন, যাক গে যেতে দাও। গাছের আড়াল থেকে আক্রমণ করতে পারে। আর জীবনের ঝুঁকি নিতে চাই না। যে জন্যে আসা তা তো পাওয়া গেছে।

—পাওয়া গেছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

—হ্যাঁ পাওয়া গেছে। ডাক্তার আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, আমাদের এই বন্ধু বেন গান আগেই আমাদের কাজ অনেকখানি সহজ করে দিয়েছে। বেন গান আগে থেকেই গুপ্তধন উদ্ধার করে রেখেছে। চল জাহাজে গিয়ে সব কথা শুনবে।

এবার আমাদের দেশে ফিরে যাবার পালা।

জাহাজ নোঙর করা হয়েছে বেন গানের গুহার কাছে।

বেন গানের গুহায় ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের লুট করা ধনরত্ন লুকোনো আছে। ধীরে ধীরে সে সব বের করা হল। উঃ! সে যে কত রকমের জিনিস তা বলে শেষ করা যাবে না।

নানা দেশের অজস্র সোনার মোহর। রাশি রাশি হীরে জহরৎ। তাল তাল সোনার বাট। আর সোনার অলংকার। সাত রাজার ধনই বটে।

নৌকো বোঝাই করে ওগুলো জাহাজে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা সবাই জাহাজে উঠলাম। বেন গান ও লং জনও আমাদের সঙ্গে চলল।

তিন জন দস্যু এই রত্নদ্বীপে পড়ে থাকল কোন গভীর জঙ্গলে। তাদের জন্যে খাদ্য ও বন্দুক রেখে যাওয়া হল।

জাহাজের নোঙর খুলে দেওয়া হল। জাহাজ ধীরে ধীরে কূলের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে।

আর সেই সময় দেখা গেল এক করুণ দৃশ্য!

তিন জন দস্যু হাত জোড় করে কূলে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাদের জাহাজে তুলে নিতে বলছে।

এই ভয়াবহ রত্নদ্বীপে তাদের কত বছর কাটাতে হবে কে জানে।

জাহাজ খাড়ি ছেড়ে সমুদ্রে এসে পড়ল।

ক্যাপ্টেন স্মলেট অসুস্থ শরীর নিয়েই দিব্যি জাহাজ চালিয়ে নিচ্ছেন।

সুযোগ বুঝে আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা আপনি দুর্গ ছেড়ে ম্যাপটা ওদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কেন?

ডাক্তার প্রথমটা একচোট হেসে নিলেন। তারপর বললেন, আমি বেন গানের সাথে দেখা করবার পর জানতে পারলাম আসল ঘটনা। বেন গানই আমাকে বলল যে গুপ্তধন যেখানে থাকার কথা সেখানে আর নেই। সে সব কিছু তুলে এনে লুকিয়ে রেখেছে

নিজের গুহার কাছে। কাজেই ও ম্যাপটার আর কোন মূল্য রইল না। আমি বেন গানের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের কাঠের দুর্গ ছেড়ে উত্তর খাড়িতে একটা অস্থায়ী ছাউনি বানিয়ে নিয়ে সেখানে বাস করতে লাগলাম। জনের সঙ্গে দেখা করে ম্যাপটা তার হাতে দিয়ে দিলাম। কথায় কথায় তাকে জানিয়ে দিলাম, গুপ্তধনে আর আমাদের লোভ নেই। এ গুপ্তধন ওরাই খুঁজে নিক। জন তো খুব খুশী। ও আমাদের সঙ্গে একটা আপোস করে ফেলল। দল বল নিয়ে চলে গেল আমাদের কাঠের দুর্গে। তার পরের ঘটনা তো তুমি জানো।

—বেন গান সব আপনাদের দিয়ে দিল ?

—দেবে না কেন ? ও এই দ্বীপে এই ধনরত্ন নিয়ে কি করতো। আমি বললাম, এগুলো আমাদের দিয়ে দাও। এর থেকে তুমিও ভাগ পাবে। আর তোমাকে আমরা দেশে পৌঁছে দেব। ও এতেই রাজী হয়ে গেল।

—লং জনকে সঙ্গে নিলেন কেন ?

—দ্যাখ জিম, লং জন খারাপ লোক জানি। কিন্তু ও শেষ পর্যন্ত তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে একথা তো সত্যি। ও না বাধা দিলে দস্যুরা তো তোমাকে মেরেই ফেলত।

—ও যদি আবার গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করে ?

—করে তো করবে। ডাক্তার বললেন, তবে সুবিধা কিছু হবে না।

জনের জন্যে আমাদের চিন্তা ছিল। তবে জন নিজেই সে চিন্তা দূর করে দিল। এক বন্দরে জাহাজ ভিড়তে সে কোন এক ফাঁকে জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে কোথায় পালিয়ে গেল।

আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক। ও পালিয়ে গিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে গেছে।

আমরা জাহাজে করে দেশে ফিরে এলাম। সেই ধনরত্নগুলো

আমাদের সকলের মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হল। ডাক্তার ট্রিলনী আমি আব্রাহাম গ্রে বেন গান সবাই যে যার অংশ পেলাম। রেডরুথ জয়েস ও হাণ্টারের পরিবারকে যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হল।

আমাদের আর কোন অভাব রইল না।

তবে বেন গান একদিন কথায় কথায় বলেছিল রত্নদ্বীপে নাকি এখনও প্রচুর ধনরত্ন লুকোনো আছে।

ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট অঢেল রূপার বাট ওখানে পুঁতে রেখেছে। সেগুলো ওখানে ওইভাবেই পড়ে আছে।

যে কেউ গিয়ে ওগুলো নিয়ে আসতে পারে।

॥ শেষ ॥